গণনাট্য সংঘের তাত্ত্বিক চেতনা (১৯৪৩-৬৫)

পঞ্চম অধ্যায়

এই অধ্যায়ে আমরা গণনাট্য সংঘের তাত্ত্বিক নীতি বিষয়ক আলোচনা করব। যেখানে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্ব, গণনাট্য সংঘের নাট্যাদর্শের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন শিল্পচেতনা, বিশ্বের নাট্য আন্দোলনের প্রভাব ও গণনাট্য সংঘের সম্মেলনগুলির রিপোর্ট আলোচনা করা হবে। যার মাধ্যমে আমাদের আলোচ্য সময়কালে (১৯৪৩-১৯৬৫) গণনাট্য সংঘের তাত্ত্বিক ভিত্তি ও তার ক্রমপরিবর্তনের রূপ প্রকাশিত হবে।

'গণ'-এর ধারণা এবং গণনাট্য আন্দোলন :

জন্মলশ্নে গণনাট্য সংঘ স্লোগান তুলেছিল, "people's Theatre Stars the People"¹ ফলে গণনাট্য সংঘের নাটক ও নাট্যপ্রযোজনার তত্ত্বগত চেতনা আলোচনার পূর্বে 'গণ' বা 'people' শব্দটির রূপ নিরূপণ করে নেওয়া প্রয়োজন। সূচনালগ্নে সংঘের পক্ষ থেকে 'গণ' শব্দের সংজ্ঞা বা 'গণ' বলতে নির্দিষ্ট করে কাদের বোঝানো হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। তবে গণনাট্য সংঘ যেহেতু বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিল, ফলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যাঁদেরকে 'প্রলেতারিয়েত' বা সর্বহারা বলে চিহ্নিত করা হয়, তাঁরাই এখানে 'গণ'। মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী 'প্রলেতারিয়েত' বলতে বোঝানো হয়, যে শ্রেণি উৎপাদনের দখলকারী বুর্জোয়ার বিপরীতে দণ্ডায়মান এবং শ্রম বিক্রয় করা সত্ত্বেও যাঁরা উৎপাদন ও জীবনধারণের মূল উপায় থেকে বঞ্চিত।^২ বৃহত্তর অর্থে শ্রমজীবী অর্থাৎ শ্রমিক-কৃষক-নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষদের 'প্রলেতারিয়েত' বলে বোঝানো হয়।

বাংলা তথা ভারতবর্ষের কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে শ্রমজীবী 'গণ' বা 'people' চিরকালই স্বমহিমায় বিরাজমান ছিল। বিভিন্ন সময়ে শোষকের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের লড়াইয়ের ইতিহাসও আমাদের অজানা নয়। একইভাবে বাংলার সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতিতে মানুষের মর্মযন্ত্রণার ইতিহাস উঠে এসেছিল। বোলান, আলকাপ, গম্ভীরা গানে কৃষিজীবী মানুষ ঈশ্বরের কাছে জমিদারদের অত্যাচার, খাজনা, ভূমি সমস্যার বিহিত চাইত। বাংলার সুপ্রাচীন লোকসংস্কৃতির সঙ্গে গণনাট্যের

সংস্কৃতি চেতনার পার্থক্য কোথায়? বা নতুন গণসংস্কৃতি আগমনের প্রয়োজন কেন ছিল? গণনাট্য সংঘের অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক শিল্পী হীরেন ভট্টাচার্য উত্তর দিয়েছেন,

"যুগের পরিবর্তনে সেদিন যারা ছিল 'লোক' বা 'Folk'—বুর্জোয়া যুগে তারাই পরিবর্তিত হলে 'গণ'-এ বা 'People'-এ। সেকালের Folk Culture, Folklore, Folk Literature ইত্যাদি পরিবর্তিত হল People's Culture, People's Song, People's Literature ইত্যাদিতে।"

অর্থাৎ তিনি স্পষ্টভাবে 'গণ' ও 'লোক'-কে পৃথক করে দেখছেন। তাঁর মতে সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় শোষিত মানুষের পরিচয় ছিল 'লোক'। যাকে ইংরেজিতে 'ফোক' বলা হয়। লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতি, লোকাচারের মাধ্যমে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ব্যর্থতার কথা উঠে এলেও নতুন সমাজের চেতনা ছিল না। তাছাড়া লোকসংস্কৃতিতে প্রাচীন সমাজের প্রতি অনুরাগ, নিয়তি-সর্বস্বতা, কুসংস্কার, জন্মান্তরবাদের মতো বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হত বলে তাঁর ধারণা। যার মধ্যে 'লোক'-এরা নিজস্ব শ্রেণিস্বার্থ আবিষ্কার করতে পারেনি। অন্যদিকে 'গণ' শোষিত হলেও রাজনীতি সচেতন সংগ্রামী শ্রেণি। যাঁরা উৎপাদন অর্থনীতির ব্যর্থতাকে বিপ্লবের মাধ্যমে নির্মূল করে সমাজেন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রস্তৃত হচ্ছেন। এই বিপ্লবের বাণীর যাত্রা শুরু হয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের লোকসংস্কৃতির মধ্যেই, কিন্তু ক্রমে বুর্জোয়া যুগের আগমনে তা পরিণত হয়েছে গণসংস্কৃতিতে।

১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা যে 'লোকচেতনা' ও 'লোকসংস্কৃতি'কে তাদের শ্রেণিস্বার্থ বজায় রাখার জন্য ব্যবহার করেছে, তাকে বামপন্থী 'গণচেতনা'য় রাঙিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। একই সঙ্গে বুর্জোয়া সমাজের মুষ্টিমেয় মানুষের ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত করে সংস্কৃতিকে ভারতবর্ষের বৃহত্তর শ্রেণির সামাজিক প্রগতি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির হাতিয়ার করে তোলা। সুধী প্রধান লিখছেন,

"ভারতের সংস্কৃতির যা কিছু মহান ঐতিহ্য ভারতীয় সমাজের অগ্রগতির পথে সহায়ক হয়েছে এই সংস্কৃতি তার থেকে শক্তি সঞ্চয় করতে চেয়েছে। সমাজের বিরাট অংশের

সৃজনশীল প্রতিভাবিকাশের সুযোগ দিয়ে এই সংস্কৃতি আন্দোলন ভারতের সংস্কৃতি আন্দোলনে এক নতুন ধরণের বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সম্পদশালী ভাবপ্রকাশের ব্যবস্থা করেছে।"⁸

ফলত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে গণনাট্য সংঘের পথচলা শুরু হয়েছিল। চারের দশকে বিশ্ব-ইতিহাসের পরিবর্তনের সংকেতকে সার্থকভাবে চিনতে পেরেছিল গণনাট্য সংঘ। তাই 'গণনাট্য' বলতে বোঝায় সেই সাংস্কৃতিক আন্দোলন যা শোষিত আর্তজনের প্রতি মমত্ববোধে জারিত এবং যারা শ্রেণিবিভক্ত সমাজে সংস্কৃতিকে শ্রেণিসংগ্রামের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাস করে। গণনাট্য কৃষক-শ্রমিক তথা শ্রমজীবী সমাজের সংগ্রামী চেতনাকে শিল্পরূপ দেবে এবং ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে শ্রমজীবীর জয়কে নিশ্চিত করবে। গণনাট্য স্পষ্টভাবেই রাজনৈতিক ভাবাদর্শের উজ্জ্বল জীবনকে চিহ্নিত করার শিল্পে বিশ্বাসী এবং যে শিল্পকলা মানুষকে অলসজড়ে পরিণত করে ও বুর্জোয়ার স্বার্থকে সুরক্ষিত করে তার বিরোধী।

চুম্বকে এটাই গণনাট্যের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য। যার মধ্যে মিশে গিয়েছিল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিপ্লবী নাট্যচর্চার আঙ্গিক। আবার লোকসংস্কৃতিকে নতুন রূপে ব্যবহারের তাত্ত্বিক নীতিও তার লক্ষ্য ছিল। অবশ্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে গণনাট্য সংঘের নীতি বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। গণনাট্য সংঘের একাধিক সর্বভারতীয় ও রাজ্য সম্মেলনের রিপোর্টে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এখানে স্পষ্ট করে নেওয়া ভালো যে আমরা গণনাট্য সংঘ ও গণনাট্য আন্দোলনকে পৃথক করে দেখেছি। একথা ঠিক যে গণনাট্য সংঘের হাত ধরেই বাংলায় গণনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত। কিন্তু গণনাট্য সংঘ ছাড়াও ক্রান্তি শিল্পী সংঘ, উত্তর সারথী, অশনিচক্র, কবচ কুণ্ডলের মতো দল সর্বহারা মানবতাবোধের আদর্শে তাদের নাটকে সাধারণ মানুষের মর্মযন্ত্রণা চিত্রিত করেছিল। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়,

"ইতিহাস অনুধাবন করলেই পাঠকেরা দেখতে পাবেন যে, সমসাময়িক কালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বাইরেও যাঁরা নাটকের ক্ষেত্রে নবতরঙ্গ আনয়নের চেষ্টা করেছেন তাদেরও মধ্যে প্রায় সমবোধই কাজ করেছে। সুতরাং এটি একটি যুগের ইতিহাস-নির্দেশিত শিল্পচিন্তা—কোনো একটি বিশেষ গোষ্ঠী বা দলেরই একচেটিয়া সম্পত্তি নয়।"^৫

গণনাট্য সংঘের একটি নির্দিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো ছিল, যার নির্দেশকে গুরুত্ব দিয়েই গণনাট্য সংঘের নাট্যচর্চা চলত। আবার সংঘের নাট্যচর্চায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষ প্রভাবও অনস্বীকার্য নয়। ফলে সাংগঠনিক নীতি বা পার্টি নীতির পরিবর্তন গণনাট্য সংঘের নাট্যচর্চায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। একই পথের যাত্রী অন্যান্য নাট্যদলগুলির কিন্তু সেই দায়বদ্ধতা ছিল না। তা বলে সংঘের সঙ্গে অন্যান্য নাট্যদলগুলির শত্রুতার সম্পর্ক ছিল না। বরং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলার গণনাট্য আন্দোলন এগিয়ে গিয়েছিল। গণনাট্য সংঘ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া বিজন ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক, উৎপল দত্ত, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবেদিতা দাস প্রমুখ ব্যক্তিত্বের নাট্যচর্চাও গণনাট্য আন্দোলনের শরিক ছিল। প্রসঙ্গত রম্যাঁ রলাঁ নির্দেশিত যে 'পিপলস থিয়েটার' দ্বারা গণনাট্য সংঘ অনুপ্রাণিত ছিল, সেই পিপলস থিয়েটারও একটি নির্দিষ্ট দলকে ঘিরে আবর্তিত হয়নি। এমনকি সব দলের উদ্দেশ্যও এক ছিল না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পথেই তারা পিপলস থিয়েটারের শরিক হয়ে উঠেছিল। বাংলার নাট্য-আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী সলিল সেন লিখেছেন,

"আন্দোলন কথাটি শুধু কথার কথাই নয়। শুধু উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি নয়। এর পিছনে সুনিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক মতবাদের প্রেরণা ও সংগঠন কৌশলও কাজ করেছিল। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এমনই একটি উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত সংস্থা হিসেবে কাজ শুরু করেন।... বর্তমানকালে এদের মধ্যে থেকেই মতান্তর হয়ে বা নেতৃত্বের সচেতনতায় অনেক থিয়েটার গ্রুপ বা নাট্যগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। দৃশ্যতঃ এদের মধ্যে চিন্তার বহু পার্থক্য দেখা যায়। আদর্শ, শিল্পগত প্রয়োগ, আঙ্গিক, শিল্পধারণা অথবা সমাজতান্ত্রিক বিশ্লেষণে এদের মতান্তর সর্বজনবিদিত হলেও মৌলিক প্রেরণায় এদের মতান্তর কোথাও নেই।"

মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্ব :

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের তাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাতে আমরা মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে সামান্য ধারণা তৈরি করে নিতে চাই। যে রাজনৈতিক আদর্শের উপর ভিত্তি করে গণনাট্যের নাট্যচিন্তার সূচনা, তার গভীরে পৌঁছোতে হলে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের ধারণা প্রয়োজনীয়। অবশ্য মার্কস, এঙ্গেলস বা লেনিন তাঁদের শিল্প-সাহিত্য সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা নিয়ে স্পষ্ট ও সুসংবদ্ধ কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। তাঁদের চিঠিপত্র বা বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে মতামতকে একত্রিত করে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের রূপ নির্মিত হয়েছে। ফলে লুকাচ, ব্রেশট, গোর্কি, ঝানভ (Andrei Zhdanov) বা লুনাচারস্কি প্রমুখ মার্কসীয় তাত্ত্বিকদের নন্দনতত্ত্বের উপলব্ধিতে পার্থক্য রয়েছে। যা মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বকে বহুভাবে ব্যবহার করার রাস্তা খুলে দেয়।

মার্কস ও এঙ্গেলস দুজনেই ছিলেন সাহিত্যপ্রেমিক এবং বহু ভাষার সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁদের পরিচ্ছন্ন ধারণা ছিল। সমাজচেতনার মতো সাংস্কৃতিক চেতনাকেও তাঁরা অর্থনীতির প্রসঙ্গ দিয়ে বিচার করেছেন। তার মানে অবশ্য এই নয় যে অর্থনীতির কার্যকারণকেই তাঁরা শিল্প-সাহিত্যের নিয়ন্ত্রক শক্তি রূপে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের মতে অর্থনীতি Base বা ভিত্তি এবং সংস্কৃতি সেই ভিত্তির উপরে তৈরি হওয়া সুপার স্ট্রাকচার (Super Structure) বা অধিসোধ। অর্থাৎ সাহিত্য-সংস্কৃতি যে অর্থনৈতিক ভিত্তির (পুঁজিবাদী, সামন্ততান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক) উপর দাঁড়িয়ে থাকে, তার নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সেই অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রতিফলন ঘটায় কিংবা তার প্রয়োজন পূরণ করে। অর্থাৎ শিল্প-সাহিত্যও একদিক থেকে 'উৎপাদন', তবে তা জৈব শ্রমভিত্তিক নয়, মানবিক। তাই শ্রেণিবিভক্ত সমাজের বহু পূর্বেই শিল্প-সাহিত্যের নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে বান্তব জগতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ক্রমে বুর্জোয়া অর্থনীতির আগমন শিল্পীর শ্রমকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার জাঁতাকলে নিম্পেষণ করে নির্মাণ ও সৃষ্টির পার্থক্য গুলিয়ে দেয়। পাঠক-দর্শকের সঙ্গে স্রষ্টার সম্পর্ক ভোজা ও উৎপাদকের সম্পর্কে পরিণত হয়। বুর্জোয়া সমাজের জালে জর্জরিত শিল্পী সৃষ্টিসন্তার অপমানের যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আকাশকুসুম কল্পনার জগৎ নির্মাণ করেন। ফলে শিল্পী তাঁর শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং সমাজের যাবতীয় সমস্যকে উপেক্ষা করা শুরু

করেন। এভাবে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি তার শিল্প-সাহিত্যের অধিসৌধকে নিজের প্রয়োজন পূরণে ব্যবহার করে।

সাহিত্যের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য নিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলসের স্পষ্ট কিছু মতামত ছিল। মার্গারেট হার্কনেসের 'A City Girl' উপন্যাসের সমালোচনায় এঙ্গেলস লিখেছিলেন, "The more the opinions of the author remain hidden, the better for the work of art"^৭। অর্থাৎ শিল্পীর অভিপ্রায় গৌণ হয়ে অভিকৃতির অভিপ্রায় যত বেশি প্রকাশিত হবে, তত তার নান্দনিক মূল্য বৃদ্ধি পাবে। তাই তিনি বালজাকের শ্রেণিচরিত্র অগ্রাহ্য করে, তাঁর সাহিত্যের মহান দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ওই একই চিঠিতে তিনি মন্তব্য করেন,

"Realism, to my mind, implies, besides truth of detail, the truthful reproduction of typical characters under typical circumstances. Now your characters are typical enough, as far as they go;"^b

এখান থেকেই 'টিপিকাল' বা 'প্রতিভূস্থানীয়' চরিত্র ও পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীকালে মার্কসীয় নন্দনতাত্ত্বিক গ্রেওর্গ লুকাচের দেওয়া ধারণা অনুযায়ী 'প্রতিভূস্থানীয়' বলতে একটি চরিত্রকে শুধু বাস্তবের প্রতিফলন দেখালেই হবে না, কেন ও কীভাবে সে বাস্তবের প্রতিভূ হয়ে উঠছে, তাও দেখাতে হবে। ১৯৩৪-র পরে রাশিয়াতে যখন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্ব জোরদার হতে থাকে, তখন গেওর্গি মালেনকভের দেওয়া ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'প্রতিভূস্থানীয়' মানে যার মধ্যে সামাজিক শক্তির মূল তত্ত্বটি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়, তাকেই বলা হবে 'প্রতিভূস্থানীয়'।^৯ মার্কসীয় দর্শনে বিষয় ও আঙ্গিক উভয়ে মিলে পূর্ণতার সৃষ্টি হয়। তাই বস্তু ও চেতনা—দুটির কোনোটিকেই মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বে অবহেলা করা হয় না। এক্ষেত্রে বিষয় ও আঙ্গিকের উভয়েরই গুরুত্ব সমান।

মার্কস বা এঙ্গেলসের মতো লেনিনও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তবে সাহিত্য বা শিল্প নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তিনি শিক্ষামন্ত্রী লুনাচারস্কির উপরেই বেশি নির্ভর করতেন। লেনিনের

সময়ে রাশিয়ায় কমিউনিস্ট শাসনে শিল্প-সংস্কৃতিতে পার্টি ও রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে বেশ কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়। পার্টি-লাইন মেনে সাহিত্য সৃষ্টি বা শিল্পীর স্বাধীনতা নিয়ে পশ্চিমী কমিউনিস্ট-বিরোধী দেশগুলি সোচ্চার হয়ে ওঠে। লেনিনের বক্তব্য ছিল সকল সমাজব্যবস্থাই শিল্পীকে তাঁর সমসাময়িক অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরে অধিসৌধ নির্মাণ করতে সাহায্য করে। বুর্জোয়া সমাজে তা হয় পরোক্ষভাবে, সমাজতন্ত্রে প্রত্যক্ষভাবে। এবং তা প্রযোজ্য হয় সমাজতন্ত্রে অবস্থিত বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন লেখকদের জন্য। কারণ, একজন বুর্জোয়া বা পেটি-বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন শিল্পী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে নিজেকে খাপ না খাওয়াতে পেরে ক্রমশ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। ফলে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যিক প্রতিভা বিকশিত হওয়ার বদলে ক্রমশ সংকুচিত ও খণ্ড হয়ে যায়। তাই সাহিত্যে 'পার্টি লাইন' প্রয়োজন। সাহিত্যে লেনিনের 'পার্টি লাইন'-এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র 'পরিচয়' পত্রিকায় 'মার্কসীয় আর্টততত্ত্ব ও লেখকের স্বাধীনতা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন,

"(১) সাহিত্যিকদের মনে প্রলেতারিয়েত শ্রেণি ও সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে একটি পার্টিজান মনোভাব এবং তাদের জয়লাভ সম্বন্ধে একটি সুদৃঢ় আস্থা, গর্ববোধ ও আনন্দবোধ জাগানো; (২) রিয়ালিস্ট সাহিত্যের সর্বকালীন সাধারণ নিয়মগুলিকে যথোচিত পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের নতুন ঐতিহাসিক অবস্থায় প্রয়োগ করা।"³⁰

এই কারণে লেনিন চেয়েছিলেন সাহিত্য হবে সংগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কাজের অঙ্গ। সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি যেভাবে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে বিপ্লবকে রক্ষা করছে এবং সর্বহারার অধিকারকে সুনিশ্চিত করছে, সাহিত্য তার পাশে দাঁড়াবে। অবশ্য সাহিত্যকে শুধুমাত্র সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থার যথাযথ প্রতিবিম্বক রূপে লেনিন দেখতে চাননি। বা পার্টিজান মনোভাবাপন্ন শিল্পী কী সৃষ্টি করবেন এবং কীভাবে করবেন, তার ধারণা তিনি চাপিয়ে দিতে চাননি। শিল্পীর উদ্দেশ্য সরাসরি প্রকাশিত না হয়ে অভিপ্রেতের অভিপ্রায় প্রকাশের ব্যাপারে তিনি এঙ্গেলসের সঙ্গে একমত ছিলেন। সমাজতান্ত্রিক দেশে শিল্প-সাহিত্যের রূপ সম্পর্কে লেনিন ক্লারা জেটকিনকে লিখেছিলেন,

"শিল্প জনগণের। এর মূল শ্রমজীবীদের জীবনের গভীরে উপ্ত হওয়া উচিত। শিল্প শ্রমজীবীদের বোধগম্য এবং প্রিয় হয়ে উঠবে। তাদের মুক্ত করবে, তাদের অনুভূতি, ভাবনা ও ইচ্ছাকে একত্র ও উন্নত করবে। তাদের কর্মস্পৃহাকে উৎসারিত করবে এবং ভিতরকার শিল্পসৃষ্টির প্রবণতাকে বিবৃদ্ধি দেবে।"³³

অবশ্য পরবর্তীকালে ঝানভের হাত ধরে 'পার্টি-লাইন' গলার ফাঁসের মতো চেপে বসে। অর্থনীতির ব্যাপারটিতেও অতিরিক্ত জোর দেওয়া শুরু হয়। তাছাড়া লেনিনের সাহিত্যচিন্তা অভিব্যক্ত হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোতে। কিন্তু পুঁজিবাদী দেশের কমিউনিস্ট লেখকদের সাহিত্য-শিল্পের পদ্ধতি কীরকম হবে, সেই নিয়ে কোনো স্পষ্ট মতামত নেই। যা চিনের বিপ্লবের সময় রেড থিয়েটারের কার্যকলাপে বা মাও জে দং ইয়েনান ফোরামের বক্তৃতায় ছিল। তাই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নাট্যচর্চাকে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের শিল্পচিন্তার থেকেও মাও-এর ইয়েনান ফোরামের বক্তৃতা অনেক বেশি প্রভাবিত করেছিল।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ধারণা :

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ধারণাটি প্রথম নিয়ে আসেন ম্যাক্সিম গোর্কি। ১৯৩৪ সালের ১৭ আগস্ট রাশিয়ায় 'সোভিয়েত লেখক সংঘ'-এর প্রথম সম্মেলনে গোর্কি Socialist Realism বা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ধারণাটিকে যথাযথ রূপ দেন। সাহিত্যে 'বাস্তবতা' বা 'রিয়ালিজম'-এর উৎপত্তি অবশ্য আগেই হয়েছিল। যার বক্তব্য ছিল সমাজ ও পৃথিবী যেরকম চলছে, তাকে হুবহু তুলে ধরা। বুর্জোয়া সমাজে শিল্পী-সাহিত্যিকরা জীবনের প্রতিবিম্বন করেই সন্তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু মার্কসের তত্ত্ব আগমনের পরে বুর্জোয়া অর্থনীতির দুর্বলতাগুলি ক্রমে প্রকাশিত হতে শুরু করে। সেই পরিস্থিতিতে আগমন ঘটে ক্রিটিকাল রিয়ালিজমের। যে তত্ত্ব পুঁজিবাদী সমাজকে ক্রমাগত সমালোচনা করে, তার ব্যর্থতার দিকগুলি স্পষ্ট করে তুলে ধরে। এই সমালোচনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বুর্জোয়ার ক্রটি-বিচ্যুতি

দেখিয়ে তার শ্রেণিস্বার্থ বজায় রাখা। কিন্তু ক্রিটিকাল রিয়ালিজম নতুন সমাজ বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো দিকনির্দেশ করতে পারে না।

তবুও বলতে হয় ক্রিটিকাল রিয়ালিজম সমকালীন পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সরাসরি ব্যবচ্ছেদ করেছিল। তাঁদের সাহিত্যচিন্তার প্রাণবন্ততা ও চরিত্রের সোচ্চার প্রতিবাদ নতুন দ্বারপ্রান্ত উদঘাটনের সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের প্রায় ১০ বছর আগে অর্থাৎ ১৯০৬ সালে প্রকাশিত ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' উপন্যাসটিকে সমাজতান্ত্রিক বান্তববাদের ধাত্রী বলে ধরা হয়। ১৯০৫-এর বিপ্লবে গোর্কি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, আগত ভবিষ্যতের রূপ দেখতে পেয়েছিলেন। তাই তাঁর উপন্যাসে শ্রমিক শ্রেণি ও শ্রমজীবী মানুষই নায়ক। তাঁর চোখে মানুষ ক্রমাত্রিক হয়ে ওঠে—অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতে যুগপৎ সেই মানুষের পদচারণা। 'মা' উপন্যাসের পাভেল ভলাসোন্ডের জীবন শুরু হয়েছিল জারতন্ত্বের গ্লানিভরা সমাজে, বর্তমানে বিপ্লবের সংগ্রামে সে নিজেকে সমর্পণ করেছে, যা তার ভবিষ্যতের ঐশ্বর্যময় চরিত্র তৈরি করবে। 'মা' শুধু প্রাক-বিপ্লব রাশিয়াকেই নয়, সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই করা পৃথিবীর প্রতিটি দেশের শ্রমিক-কৃষক-প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন সময়ে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র দীক্ষিত করেছে।

বিশ শতকের প্রলেতারিয়েত রাজনীতি-অর্থনীতি ও তার সঙ্গে সংলগ্ন সমাজব্যবস্থার থেকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের শিল্পদৃষ্টির জন্ম। শিল্পী জানেন যে ভবিষ্যতের সমাজগঠনে শ্রমজীবীর শ্রেণির ভূমিকাই মুখ্য। তাই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের মূল কাজ শ্রমজীবীর বিপ্লবী চেতনার জয় নিশ্চিত করা এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূরণ করা। জীবন যেরকম, তার উর্ধ্বে উঠে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ আগত ভবিষ্যতের স্বপ্নালু দিনের ছবিকে তুলে ধরে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ মানবজীবনের সৃজনধর্মী চৈতন্যকে তার প্রাত্যহিক সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। যা মানুষকে নতুন লড়াইয়ে উজ্জীবিত করে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে ও পরে শ্রমজীবী মানুষের মহান কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁকে প্রতিমুহূর্তে সচেতন করে এবং দেশ-বিদেশের প্রগতিশীল মানুষকে বিপ্লবী চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার বার্তা প্রেণ করে। তবে এটাও ঠিক যে শিল্পীকে দিনের শেষে শিল্পীর কাজই করতে হবে, তিনি 'কমিটেড' হলেও প্রচারসর্বস্ব হবেন না।

সমাজতান্ত্রিক বান্তববাদ কোনো অকর্মক, জড় ধারণা নয়, শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে পুঁজিবাদী সমাজের প্রতিদিনের শ্রম ও সংগ্রামের সঙ্গে দ্বান্দ্বিকতায় সৃষ্ট এক সত্তা। ফলে লুকাচ, ব্রেশট বা লুনাচারস্কি নিজেদের মতো করে তাকে ব্যবহার করার স্বাধীনতা পান। ব্রেশট তাঁর মতো করে নাটকে সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজমকে ব্যবহার করেছিলেন। অন্যদিকে লুনাচারস্কি রুশ থিয়েটারে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের তত্ত্বকে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ও যথোপযুক্ত কাঠামো প্রদান করেছিলেন। যদিও বিপ্লবের অব্যবহিত কাল পরে সোভিয়েত রাশিয়াতে অতীত ঐতিহ্যকে 'বুর্জোয়া' বলে বর্জন করার প্রবণতা শুরু হয়েছিল। সোভিয়েত থিয়েটারে শ্রমজীবী মানুষের জয় নিশ্চিত করা ও সমাজতন্ত্রকে অক্ষুগ্ন রাখার সরল পদ্ধতি ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে যা পার্টি মতাদর্শের ফর্মুলা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। এই পদ্ধতির প্রতিবাদ করার জন্য সোভিয়েত নাট্যসমাজের একাংশের প্রতি রাষ্ট্র খড়াহস্ত হয়ে উঠেছিল।

বাংলা নাটক তথা গণনাট্য সংঘের নাটক কীভাবে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের তত্ত্বকে গ্রহণ করেছিল তার একটা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আমরা কল্পতরু সেনগুপ্তের রচনা থেকে উদ্ধৃত করতে পারি।

"সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম কেবলমাত্র জীবনকে ব্যাখ্যা করেই থেমে থাকে না, বুদ্ধির দীপ্তি, বিচারক্ষমতা ও মানবিকতার ভিত্তিতে সংগ্রাম করে জীবনের ও সমাজের পরিবর্তনের জন্য। এই সংগ্রামের মূল ভিত্তি শ্রেণি সচেতনতা এবং সমাজতান্ত্রিক শ্রেণি গঠনের পথে অগ্রসর হওয়ার আকাজ্জা। যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানুষের স্বাধীনতা, রুটি-রুজির নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা এবং শিল্প-সাহিত্য শতপুষ্প বিকশিত হওয়ার পথ মুক্ত থাকবে।"^{>>}

তবে রাশিয়ার মতো এদেশের গণনাট্য সংঘের নাটকেও একটা ছকবাঁধা কাঠামো তৈরি হয়ে গিয়েছিল। নাটকের 'সৃজনশীলতা'কে গ্রাস করে নিয়েছিল পার্টি বা সংঘের নীতি। দেশকাল পরিস্থিতি বিচার না করে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের তত্ত্ব হুবহু অনুকরণ শুরু করা হয়। অথচ বিপ্লবোত্তর যে পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের উত্থান ঘটেছিল, তারতে কখনও সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলছেন,

"ঔপনিবেশিক ভারতে আধা-সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা কী করে সম্ভব! শ্রেণি শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাই একমাত্র সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা শিল্প ও সাহিত্যে আসতে পারে ৷... এটাকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তব না বলে বলা উচিত বিপ্লবী গণতান্ত্রিক বাস্তব ৷ শিল্পীর মূল চেতনা যেখানে সমাজতন্ত্রের দিকে ৷"³⁰

তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের তত্ত্বে সমালোচনার ক্রমবিবর্তন ও পরীক্ষানিরীক্ষার স্বাধীনতা রয়েছে। যে স্বাধীনতা ব্রেশট বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছিলেন। তার প্রয়োগের বদলে প্রচলিত কাঠামোর বহুব্যবহারের ফলে নাটকের বক্তব্যে পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে।

বিশ্বনাট্যে গণচেতনা :

মানুষ যখনই শাসকের রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে কিংবা সমাজব্যবস্থার ক্রুরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যারিকেড গড়ে তুলতে চেয়েছে, তখনই নাট্যমঞ্চ টিনের তলোয়ার নিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ইংল্যান্ডে শেকসপিয়রের নাটকে রাজতন্ত্রের ব্যর্থতার চিত্র যেমন উঠে এসেছিল, তেমনই বাংলায় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের নাটক ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল। ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পর বুর্জোয়া অর্থনীতি ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উত্থানের ফলে শোষণ ও শাসনের পদ্ধতি বহুমুখীরূপ ধারণ করতে থাকে। যার রূপ প্রত্যক্ষ করার পর বিশ্বের বিভিন্ন নাট্যমঞ্চে এক পালাবদলের স্চনা হয়। শুধু বক্তব্যে নয়, নাট্য-আঙ্গিকেও এই পরিবর্তন চোখে পড়তে থাকে।

আয়ার্ল্যান্ডের থিয়েটারে গণচেতনার জন্ম হয়েছিল উনবিংশ শতকের শেষ দশক থেকে বিংশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ছায়া থেকে 'Ireland Her Own'-এর জাতিসত্তাকে বাঁচাতে আয়ার্ল্যান্ডের শিল্প-সাহিত্যের পথিকৃৎরা এগিয়ে আসেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কবি ইয়েটস, জর্জ মুর, লেডি গ্রেগরি, জন এম সিঞ্জ ও পরে সন ও'কেসি। ১৯০৪ সালে সিঞ্জের 'রাইডার্স টু দ্য সি' (Riders to the Sea) নাটকটির মঞ্চায়ন দিয়ে 'অ্যাবে থিয়েটার' তথা

আইরিশ জাতীয় নাট্য-আন্দোলনের সূচনা। ইয়েটসের অনুপ্রেরণায় লেডি গ্রেগরি 'স্প্রেডিং দ্য নিউজ' (Spreading the News) ও 'দ্য রাইজিং অফ দ্য মুন' (The Rising of the Moon) নাটকে আয়ার্ল্যান্ডের প্রাচীন লোকগাথা ও ইতিহাস নাটকে তুলে আনেন। অন্যদিকে ইয়েটস খ্রিস্টের জন্ম পেরিয়ে এক বৃহত্তর সত্যের সন্ধান শুরু করেন। তার সঙ্গে আজকের জীবনের খণ্ড ও ক্ষুদ্র সত্তাগুলিকে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি তৎপর হন। লোকগাথার বীর চরিত্রদের মূল ভাবকে যুগ-যুগান্তরের সঙ্গে মিলিয়ে আজকের 'নায়ক' চরিত্র তৈরি করেন। সন ও'কেসির নাটকে ডাবলিনের বস্তি ও শ্রমিকদের জীবনের অভিজ্ঞতা উঠে আসে।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ইংল্যান্ড-আয়ার্ল্যান্ডের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই শুরু হয়। আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সরাসরি গেরিলা-গণতান্ত্রিক যুদ্ধ ঘোষণা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ও যুদ্ধের পরে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার তাগিদে জাতীয় নাট্য-আন্দোলনকে নতুন করে গড়ে তোলা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পাশাপাশি তৈরি হয় সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের 'পার্টিজান পলিটিকাল থিয়েটার' (Partisan Political Theatre)। অনেকে একে 'মাইনরিটি থিয়েটার'-ও (Minority Theatre) বলতেন।^{১৪}

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আর্থিক ক্ষতির ধাক্কায় ইংল্যান্ডের থিয়েটারের চেতনায় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খোঁজা শুরু হয়। তার আগে পর্যন্ত ইংরেজ থিয়েটার চিরাচরিত পেশাদারি থিয়েটারের সঙ্গে অভ্যস্ত ছিল। অবশ্য নব আবিষ্কৃত থিয়েটারে সমাজবদলের রাজনৈতিক চেতনা প্রখরভাবে ছিল না। বরং আর্থিক ও মানবিক সংকটের মধ্যে বর্তমান সমাজব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা জেগে উঠেছিল। জন অসবর্ন, ক্লাইভ হেক্সটন, জন আর্ডেন, হ্যারল্ড পিন্টারের মতো নাট্যকাররা তাঁদের নাটকে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। তুলনায় আর্নল্ড ওয়েস্কারের 'রুটস' (Roots), 'দ্য কিচেন' (The Kitchen) নাটকে শ্রমজীবী মানুষদের প্রতি সহানুভূতি চোখে পড়ে। বাংলায় গণনাট্য সংঘে এঁদের নাটক প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, তবে 'নান্দীকার' প্রভৃতি গ্রুপ থিয়েটারের নাটক এঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল।

আমেরিকার নাটককে গণচেতনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ক্লিফোর্ড ওডেটসের। একই সময়ে ইউজাঁ ও'নীল মার্কিন নাটককে যাবতীয় স্থূলত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে বলিষ্ঠ মতাদর্শের পীঠস্থান করে তুলেছিলেন। ক্লিফোর্ড ওয়েটস, এলমার রাইস, লসনরা তাতে মার্কসীয় চিন্তাধারার সংযোজন করেন। ১৯৩১ সালে হ্যারল্ড ক্লারম্যান, এলিয়া কাজান, চেরিল ক্রফোর্ড প্রমুখরা নিউ ইয়র্কে 'গ্রুপ থিয়েটার' নামে একটি নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী ১০ বছরে তাঁরা বাস্তববাদী ও সমাজবাদী চেতনার ২২টি নাটক মঞ্চস্থ করেন।^{১৫} ১৯৩৫ সালে তাঁরা ক্লিফোর্ড ওডেটসের 'ওয়েটিং ফর লেফটি' (Waiting for Lefty) নাটকটি মঞ্চস্থ করেন।

'ওয়েটিং ফর লেফটি'-র নাট্যকাহিনি ট্যাক্সি-চালকদের ধর্মঘট নিয়ে রচিত। ট্যাক্সি চালকরা ধর্মঘট করতে রাজি হলেও মালিকপক্ষের দালাল তাদের মধ্যে ভাঙন ধরায়। অন্যদিকে ব্যক্তিগত জীবনের দৈন্যদশাও তাদের পিছু টেনে ধরে। তারা অপেক্ষা করে কবে 'লেফটি' নামের চরিত্রটি এসে তাদের উজ্জীবিত করবে। লেফটি আসে না, কিন্তু তারা সংঘবদ্ধ হয়ে ধর্মঘট করতে শুরু করে। নাটকের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা আর আত্মসংকটের মুখোশ এক লহমায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বদলে যায়। এই নাটকে 'এজিট-প্রপ' নাট্যচেতনাকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করেন ক্লিফোর্ড ওডেটস। লক্ষ্যণীয় গণনাট্য সংঘের অনেক নাটক এই একই ধাঁচে রচিত হয়েছিল।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ তত্ত্বের আগমনের পূর্বেও সোভিয়েত রাশিয়ার থিয়েটার যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী ছিল। ১৮৯৭ প্রতিষ্ঠিত মক্ষো আর্ট থিয়েটারে স্তানিশ্লাভস্কি ও দানচেক্ষো মেথড অভিনয়ের পরীক্ষানিরীক্ষায় রাশিয়ান থিয়েটারকে সাবলীল ও বাস্তবসম্মত করে তোলেন। সমাগত বিপ্লবের বাণীকে তাঁরা নাটকে আত্মস্থ করেছিলেন। গোগোল, তুর্গনেভ, দস্তয়েভস্কি, চেকভ, পুশকিন, তলস্তয়ের নাটক মঞ্চস্থ করে তাঁরা রাশিয়ান থিয়েটারকে আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত করেন। পাশাপাশি ছিল গোর্কির নিজস্ব নাট্যচর্চার ধরণ। ১৯১৭-র বিপ্লবের পরেই রাশিয়ার থিয়েটারে দুটি ধারা শুরু হয়। প্রলেতকুল্ট থিয়েটার ও সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজমের থিয়েটার। দ্বিতীয়টির আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি। প্রলেতকুল্ট থিয়েটারের প্রবন্ধ্রা শিল্পকে সরাসরি পার্টির আমলা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল 'এজিট-প্রপ' ও চলমান নিউজপেপারের স্লোগানধর্মী নাট্যপদ্ধতির

মাধ্যমে দর্শককে প্রতিমুহূর্তে মানসিকভাবে আঘাত করা এবং তাকে সমাজতন্ত্রের সহমর্মী করা। তারা শিল্প-সাহিত্যের বাণীকে সহজবোধ্য করে জনতার মাঝে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে লেনিন শিল্প-সাহিত্যকে সহজীকৃত করার অজুহাতে পার্টির বাহন না করে জনতার শিক্ষা ও চেতনার মানকে উন্নত করে তোলার সপক্ষে ছিলেন।^{১৬} লুনাচারস্কির হস্তক্ষেপে রাশিয়ান থিয়েটারে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দুটি থিয়েটার সমান্তরালভাবে চলতে থাকে।

১৯২৯ সালে রাশিয়ায় রেড আর্মি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৩৩ সালে মস্কোতে বিশ্বের নানা দেশের বিপ্লবী থিয়েটারগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রম্যাঁ রলাঁর 'পিপলস থিয়েটার' এবং সমকালে রাশিয়ায় প্রচলিত নাট্যরীতির সংমিশ্রণ ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। একই সময়ে জার্মানিতে আবির্ভাব ঘটে আরউইন পিসকাটর ও বের্টোল্ট ব্রেশটের। রাজনৈতিক নাটককে তাঁরা অন্য উচ্চতায় নিয়ে যান। তবে আমাদের আলোচ্য সময়ে গণনাট্য সংঘের নাটকে এঁদের নাট্যতত্ত্বের প্রত্যক্ষ কোনো প্রভাব পড়েনি। বরং উৎপল দত্তের হাতে ব্রেশটের 'এপিক থিয়েটার'-এর তত্ত্ব শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে হিটলারের নাৎসি জার্মানির হাতে ফ্রান্সের পতন ঘটে। ১৯৪২ সালে ফ্রান্সের পাঁচজন নাট্যকার ক্লদ ভারমোরেল, হেনরি দ্য মন্তঁ, জঁ পল সাত্রঁ, পল ক্লদেল, আনাউস ফেইতে ও জঁ আনুইলাহ্-র লেখা ছটি নাটকে পরাধীনতার অন্ধকারের মধ্যে আলোর শিখা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। নাটকগুলিতে সরাসরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা ফ্রান্সের সমকালীন পরিস্থিতির কথা আসেনি। ফ্রান্সের পুরাণ, মহাকাব্য, আখ্যান ঘেঁটে তাঁরা এমন নাটক নির্মাণ করেন, যার বাণী শুধুমাত্র স্বাধীনতাকামী ফ্রান্সবাসীর পক্ষেই বোঝা সম্ভব ছিল। নাৎসি জার্মান আর ভিশি সরকারের নাকের সামনে তাঁরা যেভাবে সারা ফ্রান্স জুড়ে এই নাটকগুলি মঞ্চস্থ করেছিলেন তার কাহিনিও যথেষ্ট রোমহর্যক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্যাসিস্ত ইত্যালির অভ্যন্তরেও শুরু হয় 'লা পাসারান' বা প্রতিরোধের নাট্যচর্চা।

১৯৪৯ সালে যখন এদেশে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ কমিউনিস্ট পার্টির 'ঝুটা স্বাধীনতা' নীতি অনুসরণ করছে, তখন আফ্রিকা মহাদেশের থিয়েটারে এক নতুন থিয়েটার আন্দোলনের সূচনা হয়। প্রথমে যার নাম ছিল 'Theatre of Struggle', কিছুদিন পরেই তার নাম হয় 'Theatre of Resistance'। যার পরিকল্পনা শুরু হয় ১৯৪০ সালের আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসে।^{১৭} এই সংগ্রাম আর প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল বর্ণবৈষম্য, সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে। ইতিহাসের পাতা উল্টোলে দেখতে পাব আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে বিংশ শতকের পাঁচ আর ছয়ের দশকে। তাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে এই নাট্যচর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিবাদী নাট্যচর্চার ইতিহাস আলোচনা থেকে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেশীয় উপকথা, রূপকথা, পুরাণ, মহাকাব্যকে তাঁরা কাহিনিরূপে বেছে নিয়েছিলেন, তাঁদের দেশের লোকনাট্যের আঙ্গিকের সঙ্গে আধুনিক নাট্যকলার মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। প্রচলিত নাট্যমঞ্চের জড়তা ও অতিনাটকীয়তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। নাটকের ভাষা হয়ে উঠেছিল সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা, অথচ তাতে নাট্যসৌন্দর্যের অভাব ছিল না। নাটককে করতে চেয়েছিলেন প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মাধ্যম। কখনও সংগঠিত রাজনৈতিক চেতনায়, কখনও বা স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদী চেতনায় নাট্যমঞ্চ জনতাকে শক্তিশালী করে তুলেছিল। এটাই হয়ে উঠেছিল বিংশ শতান্দীর প্রথমার্ধের নাট্যমঞ্চের মূলমন্ত্র। এই সার্বিক আলোচনা ছাড়া বাংলা তথা ভারতে গণনাট্য সংঘের অবস্থান বিচার করা সম্ভব নয়। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ তাদের উত্তরসূরি ও সহযোদ্ধা হয়ে উঠতে চেয়েছিল। বিশ্বনাট্য আন্দোলনের বেশ কিছু পথ গণনাট্য সংঘ সরাসরি গ্রহণ করেছিল, কিছু বর্জন করেছিল, কিছু ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

রম্যাঁ রলাঁর 'পিপলস থিয়েটার' :

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নামকরণের অনুপ্রেরণা এসেছিল রম্যাঁ রলাঁ 'পিপলস থিয়েটার'-এর নাট্যতত্ত্ব থেকে। ১৯০০ থেকে ১৯০২ সালের মধ্যে রম্যাঁ রলাঁ ফ্রান্সের 'রভ্যু দ'আর্ত দ্রামাতিক' (Revue d'Art

Dramatique) পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৯০২ সালে সেগুলিকে একত্রিত করে 'লু তেয়াতর দু পুপল' (Le Theatre du Peuple) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ১৯১৮ সালে 'পিপলস থিয়েটার' নামে বইটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়।

পিপলস থিয়েটার বা আক্ষরিক অর্থে জনগণের থিয়েটারের সূচনা হয় ১৮৭৬ সালে জার্মানিতে সুরশিল্পী রিচার্ড ভাগনারের বার্ষিক অপেরায়। তিনি প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের আর্থিক মূল্যের বিভেদ মুছে দেন। ১৮৮০ সালে সেখানে শুরু হয় 'Volksbuhne' বা পিপলস থিয়েটারের আন্দোলন। নতুন নাট্যকারদের রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নাটক কম খরচে শ্রমিক, বস্তিবাসী ও নিম্নমধ্যবিত্তদের দেখানোই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। ফ্রান্সে পিপলস থিয়েটারের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন জঁ-জ্যাক রুশো। তাঁর আদর্শে মরিস পত্তিশে ১৮৯৫ সালে ফ্রান্সে পিপলস থিয়েটারের ধারণা প্রতিষ্ঠা করেন ৷^{১৮} ১৮৯৯ সালে ফ্রান্সে 'পিপলস থিয়েটার'-এর মহাসভায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে থিয়েটারের যোগসূত্রকে দৃঢ় করার ডাক দেওয়া হয়। পরিষ্কারভাবে জানানো হয় পিপলস থিয়েটারের কাজ হবে সাধারণ জনতার কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরা, তাদের দাবিদাওয়াকে সমর্থন করা।^{১৯} পিপলস থিয়েটারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জার্মানি ও ফ্রান্সে একাধিক নাট্যদল গড়ে ওঠে। তবে প্রত্যেকের লক্ষ্য এক ছিল না। সামাজিক, রাজনৈতিক, নান্দনিক, আদর্শগত বিভিন্ন দিক থেকে পিপলস থিয়েটারকে দেখা শুরু হয়। তবে থিয়েটার যে সাধারণ জনতার জন্য নির্মিত হবে, এ বিষয়ে সকলেই একমত ছিলেন। এই দলগুলির নাট্যআঙ্গিক ও নাট্যপদ্ধতিও ছিল বিভিন্ন প্রকারের। এর মধ্যে 'পলিটিকাল থিয়েটার'-এর দিকটিকেই রম্যাঁ রলাঁ আলোচনার বিষয়বস্তু করে তুলেছিলেন। রলাঁর সাফল্য এইখানে যে তিনি পিপলস থিয়েটারকে 'পলিটিকাল স্ট্র্যাটেজি'^{২০} করে তুলেছিলেন। প্রসঙ্গত গ্রন্থরচনা কালে রলাঁ কমিউনিস্ট আদর্শে দীক্ষিত ছিলেন না। ফলে তাঁর গ্রন্থে নতুন সমাজব্যবস্থা বলতে কোথাও সমাজতন্ত্র বোঝাতে চাননি। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় অ্যাজিট-প্রপ নাট্যচর্চার প্রয়োগ ও বিস্তারের সময় 'পিপলস থিয়েটার'-এর ধারণা বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়।

রম্যাঁ রলাঁর মতে পিপলস থিয়েটার শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট গড়ে তুলে নতুন সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। পিপলস থিয়েটারের সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট অতীত ও বর্তমানের সংযোগরক্ষা করবে

এবং আগামীদিনের পথ দেখাবে। থিয়েটার হবে আসন্ন পরিবর্তনের সাংস্কৃতিক ইন্তেহার, নগরকেন্দ্রিক পুঁজির দাসত্ব অস্বীকার করে থিয়েটার গ্রামে-গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে। নাটকের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের মনোভূমি তৈরি করবে। প্রগতিশীল চিন্তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা মিশিয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রয়োজনে তারাই হয়ে উঠবে থিয়েটারের মূল অভিনেতা। তাদের জবানিতে উঠে আসবে তাদের কাহিনি। তার জন্য পিপলস থিয়েটারের সংগঠক ও শিল্পীদের জনগণের চেতনার স্তরকে বুঝতে হবে, লোকজীবন সম্বন্ধে গভীর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। পিপলস থিয়েটার হবে জনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা।

রলাঁর পিপলস থিয়েটারের তিনটি মূল ভিত্তি উল্লেখ করেছেন—আনন্দ, শক্তি বা উৎসাহ এবং বুদ্ধিদীপ্ততা। প্রথম শর্ত ছিল থিয়েটারকে অবশ্যই বিনোদন বা Recreation হতে হবে। জীবনের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে সংগ্রামরত মানুষকে থিয়েটার আনন্দ প্রদান করবে। তার নুয়ে পড়া দেহ ও মনকে প্রফুল্লতায় ভরিয়ে তুলবে। তাঁর নির্দেশ,

"নাট্যকারদের কাজ হবে এদিকে লক্ষ্য রাখা যে তাদের নাটক যেন আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে; দুঃখ-বিষাদ বা বিরক্তি যেন তৈরি না করে। জনগণকে ক্ষয়িষ্ণু শিল্প উপহার দেওয়ার মতো বাজে জিনিস আর নেই, নিছক অহঙ্কার অথবা চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা হিসেবেই তাকে ক্ষমা করা যেতে পারে মাত্র। এই ধরণের শিল্প কোনো কোনো সময় জনগণের মনে খারাপ প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করে।"^{২১}

পিপলস থিয়েটারের দ্বিতীয় শর্ত হল তাকে অফুরন্ত শক্তির উৎস হতে হবে। যাতে জনগণ পরের দিন আরও ভালোভাবে কাজ করার মানসিক শক্তি পায়। উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার মাধ্যমে নায়কের জয় দেখাতে হবে। যাতে ব্যক্তিগত জীবনে বারবার পরাজিত দর্শককে আশাবাদী করে তোলা যায়। আর তৃতীয় শর্ত ছিল জনগণকে নানা অভিজ্ঞতা ও পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে হবে। পুরনো নাট্যশিল্প মানুষের বুদ্ধিকে ভোঁতা ও সংকীর্ণ করে তুলছে, পিপলস থিয়েটার তাকে

ফের ক্ষুরধার করে তুলবে। তার জন্য নীতিশিক্ষা দেওয়ার প্রবণতা এড়িয়ে নাটককে প্রাণচঞ্চল করে তুলতে হবে।

নাটকের চরিত্র নির্মাণ কীরকম হবে, সে বিষয়েও তিনি লক্ষ্য রেখেছিলেন। সাধারণ রঙ্গালয়ের মতো একক চরিত্র নয়, পিপলস থিয়েটারের নায়ক হবে জনগণ বা জনগণের একটা বিরাট অংশ। কোরাসের উপস্থিতি ও সমবেত সংলাপ অবশ্যই থাকতে হবে। ব্যক্তির সঙ্গে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হবে। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটনা পরম্পরায় সমগ্র শ্রেণির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে। যার সমাধান হবে দ্রুত ও ব্যাপক গণসংঘাতের মধ্য দিয়ে। নাট্যকাহিনিতে শোষক শ্রেণির প্রতি ঘৃণা বর্ষিত হবে। কারণ ন্যায়সঙ্গত ঘৃণাই শোষকের বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণিকে উদ্ধীপিত করে, একত্রিত করে। শোষকের প্রকৃত রূপকে উন্মোচন করতে হবে। রম্যাঁ রলাঁর ভাষায়,

"শয়তানের যে-মূর্তিকে আমরা মুখোমুখি দেখতে পাচ্ছি, তাকে যে দেখা যাচ্ছে এ-বিষয়ে যে শয়তান সচেতন, সে তো অর্ধেকের বেশি বিজিতই হয়ে যাচ্ছে। সামাজিক নাটকের কাজই হল যুক্তির দুর্দমনীয় শক্তিকে অনন্ত পরিধিতে ছড়িয়ে দেওয়া।"^{২২}

শিল্পীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন যে বাস্তবের অন্যায়-অবিচার সংশোধনের চেষ্টা না করে মুখ বুজে সহ্য করে গেলে প্রকৃত শিল্পী বা প্রকৃত অর্থে মানুষ হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। তাঁর মতে, "যে লোক অশুভকে ঘৃণা করতে শেখেনি, সে কখনও ভালোকে ভালোবাসতে পারে না।"^{২৩}

অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ আঙ্গিক ছিল লোকসংস্কৃতি। শহরের মানুষ অতীতকে ভুলে গেলেও পিপলস থিয়েটারের মূল লক্ষ্য গ্রামের মানুষ আজও এক বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। লোকগাথা, লোকজ গল্প-গানের মধ্যে আছে আনন্দের অফুরন্ত উৎস। কয়েকশ বছর ধরে রূপকথা, উপকথা, পুরাণকাহিনিগুলি লিঙ্গ-বর্ণ-বয়স নির্বিশেষে মানুষকে বিনোদন ও কর্মক্ষমতায় ভরিয়ে রেখেছে। ফলে লোকসংস্কৃতির অমরত্ব নিয়ে কোনো সংশয় নেই; বর্তমান পিপলস থিয়েটারের কাজ হবে সেই অমরত্বের সন্ধান করা। এই প্রসঙ্গে তিনি চেয়েছিলেন পিপলস থিয়েটার মহান ঐতিহাসিক নাটক সৃষ্টি করুক। ইতিহাসের আবেগপূর্ণ ঘটনার বিপুল ভাণ্ডারের মধ্যে থেকে গোটা

জাতির স্পন্দন তুলে ধরুক। ঐতিহাসিক নাটক জনগণের বুদ্ধি ও বিবেককে নতুন আদর্শ সৃষ্টি করার সুযোগ করে দেয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে উৎপল দত্ত রম্যাঁ রলাঁর 'পিপলস থিয়েটার'-এর 'অমর নাট্য' সৃষ্টি ধারণার সঙ্গে মতপার্থক্য পোষণ করতেন।^{২৪} এমনকি 'পিপলস থিয়েটার' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদক রথীন চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে তিনি বইটিকে 'গণনাট্য আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকারক' বলেও দাবি করেন।^{২৫} যার বিরোধিতা করেছিলেন সুধী প্রধান ও রথীন চক্রবর্তী।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পক্ষে 'পিপলস থিয়েটার'-এর যাবতীয় তত্ত্ব প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল না। বিশেষত রলাঁর যে মঞ্চ-পরিকল্পনা, ভারতের প্রতিকূল রাজনৈতিক অবস্থায় গণনাট্য সংঘের কাছে সেই পরিকাঠামো ছিল না। ফ্রান্সের থিয়েটার ব্যবস্থায় কর্মফেরত শ্রমিকদের জন্য সংরক্ষিত আসনের দাবি রলাঁর পক্ষে সংগত ছিল। তিনি রিভলভিং স্টেজ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন, যেমন 'নবান্ন' নাটকে ব্যবহৃত হয়েছিল। তিনি নাটকের কাহিনি ও রুচিসম্মত বিশাল দৃশ্যপট ও জমকালো পোশাক ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন। মঞ্চ-শিল্পকে ব্যবহার করে জনগণের কাছে পৌঁছোনোর জন্য যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।^{২৬} কিন্তু ভারতের গ্রামে-গঞ্জে বা শ্রমিক বস্তিতে সেই সুযোগ কোথায়! তাছাড়া রলাঁ বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে ফ্রান্সের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে দাঁড়িয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনাগত ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করেছিলেন। অন্যদিকে গণনাট্য সংঘ স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতবর্য্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ভঙ্গুর কৃষিব্যবস্থাকে মাথায় নিয়ে শিল্পের সঙ্গে সংগঠিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে যুক্ত করতে চেয়েছিলে।

তত্ত্বের সাফল্য-ব্যর্থতা তার প্রয়োগ নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়ন তার মতো করে 'পিপলস থিয়েটার'-এর তত্ত্ব গ্রহণ করেছিল। কোনো বিশেষ রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে সংযোগহীন 'পিপলস থিয়েটার'-কে প্রয়োজন মতো এজিট-প্রপ ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিল। রম্যাঁ রলাঁর 'পিপলস' রাশিয়ায় বামপন্থী রাজনৈতিক চেতনা পেল। ১৯২৩ সালে রাশিয়ায় শ্রমিকদের 'ব্লু ব্লাউজেস' নাট্য-আন্দোলনের সৌজন্যে 'পিপলস থিয়েটার'-কে নতুন রূপে আবিষ্কার করা গেল। কারখানার নীল পোশাক পরা শ্রমিকরা হালকা ও বহনযোগ্য মঞ্চসামগ্রী নিয়ে সমগ্র রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ত।^{২৭} রলাঁর মঞ্চ-ভাবনার জৌলুস প্রয়োগ এখানে

ଏ8୪

উপযোগিতার কারণে বাদ পড়ে যায়। ভারতে গণনাট্য সংঘের অন্যতম মূল ভিত্তিরূপে 'পিপলস থিয়েটার'-এর ধারণাকে যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল তাতে রাশিয়ার প্রভাব বেশি লক্ষ্যণীয়। 'নবান্ন' ব্যতীত অন্য নাটকের মঞ্চব্যবস্থায় 'ব্লু ব্লাউজেস'-এর পদ্ধতি অনুসরণ করা হত। ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটকের বদলে গণনাট্য সংঘ প্রাত্যহিক সমস্যা তুলে ধরা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিল। তবে নামকরণ, নাটকের প্রাথমিক শর্ত পূরণ ও জনগণের কাছে যাওয়ার তাত্ত্বিক মন্ত্রগ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ 'পিপলস থিয়েটার'-এর কাছে অবশ্যই ঋণী।

চিনের নাট্য আন্দোলন এবং মাও জে দং-এর ইয়েনান ফোরামের বক্তৃতা :

সুধী প্রধান তাঁর 'Marxist Cultural Movement in India' গ্রন্থে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের তাত্ত্বিক ভিত্তিরূপে চিনের নাট্যপ্রযোজনার প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত 'Drama Goes to War' প্রবন্ধটি থেকে চিনের বৈপ্লবিক নাট্যচর্চার সম্পূর্ণ রূপ ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘে তার প্রভাবের ইতিহাস জানা যায়। প্রবন্ধটি ১৯৪৩ সালে গণনাট্য সংঘের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনের অন্তর্গত ছিল। চিনের রেড থিয়েটারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিখ্যাত আমেরিকান সাংবাদিক এডগার মো-র 'Red Star Over China', অ্যানা লুইস স্ট্রং-এর লেখা এবং চৈনিক নাট্যপ্রযোজক উই কুং-চি-র (Wei Kung-chi) সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছিল।^{২৮}

চিন ছিল কুয়ো-মিং-তাং রাজতন্ত্রের অন্তর্গত এবং ১৯৩১ সালে চিনের একটা বিরাট অংশ জাপানিদের হাতে চলে আসে। ফলে মাও জে দং-এর নেতৃত্বাধীন চিনের কমিউনিস্ট পার্টিকে রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ দু-পক্ষের বিরুদ্ধেই লড়তে হয়েছিল। জাপানি আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য তিনের দশকের শুরুতে Peoples Anti-japanese Dramatic Society' গঠন করা হয়। তারা চিনের বিভিন্ন স্থানে নাটিকা-সংগীত-নৃত্য-প্যান্টোমাইম সহযোগে জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে মানুষকে সজাগ করত এবং আগত বিপ্লবের বাণী ছড়িয়ে দিত। তাদের প্রযোজনাগুলির বক্তব্য ছিল প্রচারমূলক,

দ্লোগানে ভরপুর এবং সামান্যতম সম্বলকে তারা নাটকের মঞ্চসজ্জা ও 'প্রপস' রূপে ব্যবহার করত। প্রায় সবকটি অনুষ্ঠানের অন্তিমে জাপানি সৈন্যদের কুৎসিত পরাজয় ও চিনের কমিউনিস্ট সৈন্যদের জয়লাভ অবধারিত ছিল। এভাবেই চিনের 'পিপলস থিয়েটার'-এর সূত্রপাত হয়। ১৯৩৪ সালে চিনের বিখ্যাত 'লং-মার্চ' শুরু হয়। সেই সময়ে চিনের রেড থিয়েটার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। রেড থিয়েটারের ৬০টি দল বিভক্ত হয়ে রেড আর্মির পরবর্তী লক্ষ্যস্থলে ছড়িয়ে পড়ত। ফাঁকা মাঠে, ভাঙা মন্দিরের সামনে, গাছের তলায় যেখানে সুযোগ পেত, সেখানে তারা গ্রামের লোকজনকে জড়ো করে নাটক প্রযোজনা করত। নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মনোভূমি প্রস্তুত হয়ে থাকার ফলে চিনের রেড আর্মির কাজ অনেক সহজ হয়ে যেত, অনেক ক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা স্বতঃক্ষূর্তভাবে তাদের সহযোগিতা করত। এমনকি কুয়ো-মিং-তাং সরকারের সৈন্যরাও রেড থিয়েটারের নাটক দেখার জন্য উপস্থিত হত।^{২৯}

১৯৩৭ সালে চিনের ইউনাইটেড ফ্রন্টের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ গুরু হয়। দু'লক্ষ 'ড্রামা সোলজার' চিনের গেরিলা সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখসমরে উপস্থিত থাকত। তাঁদের স্লোগান ছিল 'Save the Nation through Drama'। প্রখ্যাত চৈনিক সাহিত্যিক জিয়াং বিংজি ওরফে টিং লিং (Ting Ling) সেই সময়ে রেড থিয়েটারের সঙ্গী ছিলেন। তাঁর মত ছিল 'প্রোপাগান্ডা ইজ আর্ট'। যে দেশের প্রত্যন্ত গ্রামীণ জনগণের 'আর্ট' সম্বন্ধে ন্যূনতম ধারণা নেই, তার কাছে বিপ্লবের বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রোপাগান্ডাই একমাত্র পদ্ধতি। 'লং-মার্চ'-এর সময়কালের মতো রেড থিয়েটার যুদ্ধের পূর্বে জনগণকে জাপ-আক্রমণ সম্বন্ধে সচেতন করত, রেড আর্মির ভূমিকা বোঝাত, নাটকের মাধ্যমে মত বিনিময় করত। দেশের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তারা সহজবোধ্য, কৌতুকময় 'লিভিং নিউজপোর'-এর ভঙ্গিতে তুলে ধরত। শিল্পীরা সাধারণ সৈনিকের মতো জীবনযাপন করত, মুখে মুখে নাটক রচনা করত, সাধারণ জনগণকে বিপ্লবের গান শেখাত।^{৩০} রেড থিয়েটারের নাটকের চরিত্ররা ছিল সাধারণ মানুষের মতোই। কোনো মহান ঐশ্বরিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাদের ছিল না। তাঁরা মদ্যপান করত, অশান্তি করত, লড়াইয়ে যেতে ও অত্যাচারের মুখে ভয় পেত; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করত না।^{৩১}

১৯৪২ সালে মে মাসে মাও-জে-দং চিনের ইয়েনান ফোরামে সাহিত্য-শিল্প প্রসঙ্গে বিখ্যাত ভাষণটি দেন। তাঁর বক্তব্য বিপ্লবী নাট্য-আন্দোলনকে আদর্শগত শক্তিশালী মঞ্চ দেয় এবং চিনের পরিস্থিতিতে শিল্পের ভূমিকা সূত্রাকারে বিধিবদ্ধ করে দেয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও শিক্ষিত করে তোলা এবং শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সাহিত্য ও শিল্পকে সমগ্র বৈপ্লবিক যন্ত্রের সঙ্গে একাত্ম করে দেখানো। চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অন্যতম সক্রিয় কর্মী লু-দিংয়ি (Lu Dingyi) মাও-এর বক্তৃতার প্রভাব সম্পর্কে লিখেছেন,

"এর ফলে যে কেবল সাহিত্য ও শিল্পের মর্মবস্তু আরও সমৃদ্ধ এবং প্রাণবন্ত হয়েছে তাই নয়, এর ফলে মেহনতি জনতার মতাদর্শ ও ভাবাবেগের বাহন হয়েছে সাহিত্য ও শিল্প। এই সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমেই মজুর চাষিকে সঠিকভাবে শিক্ষিত করে তোলা যাবে।"^{৩২}

মাও প্রথমেই প্রশ্ন তুলছেন শিল্প-সাহিত্য কার জন্য নির্মিত হবে? তাঁর উত্তর শিল্প-সাহিত্য হবে বৃহত্তর জনগণের জন্য। সবার আগে হবে বিপ্লবের নেতৃত্বকারী শ্রমিকদের জন্য, তারপর হবে বিপ্লবের সবচেয়ে বড়ো মিত্র বিপুল সংখ্যক কৃষকদের জন্য। তারপর অষ্টম রুট ও অন্যান্য সশস্ত্র সেনাদের জন্য এবং সব শেষে শহুরে পেটি-বুর্জোয়াদের জন্য।^{৩৩} গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক শিল্প ও শহুরে বুর্জোয়া শিল্প শুধু শোষক ও অত্যাচারীদের তোষামোদ করেছে। যা বুর্জোয়া শ্রেণির অন্তর্গত তা কখনই জনগণের হতে পারে না। বর্তমান শিল্পের কাজ হবে উল্লেখিত চার ধরণের জনতার সেবা করা। কীভাবে সেবা করবে তার উত্তরও তিনি দিয়েছেন। শিল্প জনতার বর্তমান স্তরের উন্নতিসাধনের জন্য নির্মিত হবে। 'উন্নয়ন' মানে শ্রমিক-কৃষকদেরকে সামন্তশ্রেণি, বুর্জোয়াশ্রেণি কিংবা পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের উচ্চতায় তোলার কথা বোঝানো হচ্ছে না। বর্তমানে শ্রমিক-কৃষকরা যে পথে এগোচ্ছেন, সেই পথের শেষে থাকা সমাজতন্ত্রের প্রকৃত উচ্চতায় মানুষকে তুলে ধরতে হবে। তার জন্য শিল্পীকে বিপ্লবের প্রচণ্ড অভিঘাতের মধ্যে জীবিত থাকতে হবে, বিপ্লবের নিত্যসঙ্গী হতে হবে।^{৩8}

মাও বলছেন সাহিত্যের উপাদান গ্রহণ করতে হবে দুটি উৎস থেকে। প্রথমত সংগ্রামরত জনতার জীবন্ত, সমৃদ্ধ ও মৌলিক বিষয়বস্তুতে ভরা জীবন অভিজ্ঞতা থেকে। যে অভিজ্ঞতার কাছে

সকল সাহিত্য ও শিল্পকে বিবর্ণ মনে হয়। তাঁর মতে, "বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্প হচ্ছে বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের মস্তিষ্কে প্রতিফলিত জনগণের জীবন্ত চিত্র।"^{৩৫} দ্বিতীয়ত বিদেশি ও অতীতের সাহিত্য থেকে। তবে সে বিষয়ে তিনি সাবধানতা অবলম্বন করতে বলেছিলেন, কারণ তার মধ্যে সামন্ততন্ত্র ও বুর্জোয়া শ্রেণির মূল্যবোধ মিশে রয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত যা কিছু চমৎকার, যা কিছু জনতার মান উন্নয়নের জন্য হিতকর তাকে বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে গ্রহণ করতে বলেছিলেন।

মাও চেয়েছিলেন এমন শিল্প প্রযোজিত হোক যা জনতাকে শিক্ষা দেবে, সাহিত্য ও শিল্পগত প্রয়োজনীয়তা মেটাবে, সংগ্রামের প্রেরণা দেবে এবং বিজয় সম্বন্ধে আস্থাবান করে তুলবে।^{৩৬} তিনি বলেছেন,

''সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে 'বরফের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় অগ্নি উদ্দীপক জ্বালানির',

বুটিদার রেশমি চাদরের শোভাবর্ধনের জন্য আরও ফুলের বাহারের' নয়।"^{৩৭}

তাই শিল্প-সাহিত্যকে 'উপযোগিতাবাদ' রূপে দেখতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। সব শ্রেণি সবকালে শিল্প-সাহিত্যকে উপযোগিতার নিরিখেই বিচার করেছে। মাও দেখেছেন 'প্রলেতারীয় উপযোগিতাবাদ'-এর নিরিখে, যার মধ্যে নব্বই শতাংশ মানুষের অবস্থান। তাঁর মত ছিল শ্রেণিস্বার্থের ঊর্ধ্বে স্বাধীন শিল্প বলে কিছু থাকতে পারে না। তাই সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে বিপ্লবের কাজকর্মের একটি সুর্নিদিষ্ট রূপ ফুটে উঠবে। তার জন্য বৈপ্লবিক রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে সর্বোচ্চ সম্ভব নিখুঁত শিল্প আঙ্গিকের ঐক্য চাই।^{৩৮} মাও-এর ধারণার সঙ্গে আমরা লেনিনের 'পার্টি-লাইন' সাহিত্যসৃষ্টির মিল খুঁজে পেতে পারি।

রেড থিয়েটারে যেভাবে বিপ্লবী চরিত্রকে তুলে ধরা হয়েছিল, সে বিষয়ে তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল। অন্যদিকে কুয়ো-মিং-তাং সরকার যেভাবে সুযোগ পেলেই সংকীর্ণতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদকে ছড়িয়ে দিতে চাইছে, শিল্প-সাহিত্য তার বিরোধিতা করবে। যারা নাটক সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, তাদের সেনাবাহিনী ও গ্রামগুলির মধ্যে ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। গান,

08¢

চারুকলা, রিপোর্টাজ, পোস্টার, দেওয়ালপত্রিকা সব কটি মাধ্যমকেই ব্যবহার করা উচিত। আক্রমণকারী ও শোষকদের স্বরূপ উন্মোচন হবে অন্যতম প্রধান কাজ।

'প্রলেতারীয় সংস্কৃতি' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি দুটি মূল সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন– শ্রেণিগত অবস্থানের সমস্যা ও মনোভাবের সমস্যা। মাও-এর যুক্তফ্রন্টে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষদের সহাবস্থান ঘটেছিল। যাদের মধ্যে অনেক শিল্পী-সাহিত্যিক বিপ্লবের সঙ্গী হলেও শ্রেণিচরিত্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। মাও নির্দেশ দিয়েছেন জাপানি ও রাজতন্ত্রী শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের কপটতা ও নৃশংসতার স্বরূপ দেখিয়ে পরাজিত করতে হবে। যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য মিত্রদের ক্ষেত্রে নীতি হবে মৈত্রী ও সমালোচনার। অর্থাৎ যেখানে তারা জাপে-বিরোধিতা করবে সেখানে প্রশংসা করা হবে। আর যেখানে তারা বিপ্লবের পথে বাধা সৃষ্টি করবে বা প্রতিক্রিয়ার পথ ধরবে সেখানে তাদের তীব্র সমালোচনা করা হবে।^{৩৯}

মাও-এর ইয়েনান ফোরামের বক্তৃতা চিনের বিপ্লবকালীন শিল্প-সাহিত্যকে শক্ত ভিত্তিভূমি দেয়। বিপ্লবোত্তর সময়ে শিল্প-সাহিত্যের ভূমিকা সম্পর্কে নতুন নির্দেশ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সেই প্রশ্নটি আবার ফিরে আসে—শিল্পীর স্বাধীনতা? এ-কথা সত্য যে বিপ্লব চলাকালীন মাও শিল্প-সাহিত্যকে রাজনৈতিক উপযোগিতা সর্বস্ব করে দেখেছিলেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি শিল্পের নান্দনিক দিকটি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছিলেন। ইয়েনানের মঞ্চে তিনি বলেছিলেন, "যেসব শিল্পগত রচনার শিল্পগুণের অভাব রয়েছে তা রাজনৈতিকভাবে যত প্রগতিশীলই হোক না কেন তা হয়ে পড়ে শক্তিহীন।"⁸⁰ তাঁর মতে কোনো শিল্প রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সঠিক হলেও, তাতে শিল্পশক্তির অভাব থাকলে তার বিরোধিতা করা উচিত। কিন্তু যেখানে শিল্পের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বেঁধে দেওয়া হয়েছে, আঙ্গিককে প্রচারের মাধ্যম করে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই শিল্পের 'নান্দনিক মান' বজায় রাখার থেকেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূরণ মুখ্য হয়ে উঠবে। বিপ্লবের শেষ লগ্নে ও বিপ্লবের পরে মাও-এর মুখ নিঃস্তৃত বাণী ক্রমে অলজ্য নির্দেশে পরিণত হয়। পার্টির নিয়ন্ত্রণই শেষ কথা হয়ে ওঠে।

১৯৪৩-৪৪ সালে জাপানকে প্রতিহত করার জন্য ইংরেজ বৈমানিকদের নিয়মিত চুং-কিং যেতে হত। তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। তাদের হাত ধরে মাও-জে-দং-এর ইয়েনান ফোরামের বক্তৃতার কপি ভারতে আসে। দলিলটির আলোচনা ভারতের গণনাট্য সংঘের কর্মীদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। যদিও হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতে পি সি যোশীর নেতৃত্বাধীন সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট মাও-এর বক্তৃতাকে ব্যবহার করার তাগিদ অনুভব করেনি।⁸⁵ সুধী প্রধানের গ্রন্থে গাণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় রিপোর্টগুলির মধ্যেও মাও-এর ইয়েনান ফোরামের ভাষণের কোনো প্রসঙ্গ নেই। সেখানে চিনের রেড থিয়েটারের কার্যকলাপ, উই কুং-চি ও টিং-লিং-এর বিপ্লবী নাট্যপ্রযোজনাকে গণনাট্যের অন্যতম তাত্ত্বিক ভিত্তি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাড়া মাও-এর ভাষণের কপি ভারতে এসেছিল গণনাট্য সংঘে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। সূচনালশ্বে গণনাট্য সংঘের নাট্যপ্রযোজনার পদ্ধতি ও তার তাত্ত্বিক উদ্দেশ্য যদি আমরা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে দেখতে পাব মাও-এর বক্তৃতার সরাসরি কোনো প্রভাব তার মধ্যে নেই। বরং স্বাধীনতা পরবর্তী কমিউনিস্ট পার্টির 'ঝুটা স্বাধীনতা' নীতির সময়ে মাও-এর বক্তৃতার সরলীকৃত সংস্করণ, ল্যু-সুনের (Lu Sun) শিল্প চেতনা ও পার্টির তৎকালীন সাংস্কৃতিক নীতির একটি মিলিত রূপ গণনাট্য সংঘের কার্যকলাপে দেখা যায়।

গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে সর্বভারতীয় সম্মেলনের নীতি :

আমরা গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি কীভাবে জাতীয় ও বিশ্বরাজনীতির অভিঘাত ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য করে তুলেছিল। এই অধ্যায়ের আলোচনায় গণনাট্য সংঘের সূচনার তাত্ত্বিক ভিত্তি উঠে এসেছে। দুটি আলোচনা পাশাপাশি রাখলে গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার সার্বিক চিত্রটি উঠে আসবে। রাশিয়া ও চিনের রাজনীতি সচেতন নাট্যচর্চার প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় গণনাট্য সংঘ বিশ্ব নাট্যআন্দোলনের সমান্তরালে নিজস্ব পর্থনির্মাণ শুরু করে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জনগণের নাট্যচর্চা আবর্তিত হয়েছিল সংশ্লিষ্ট দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থা ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে মাথায় রেখে। রাশিয়ার কমিউনিস্টদের লড়তে হয়েছে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে, চিনে লড়তে হয়েছে সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া, ফ্রাঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল, একই সময়ে চিনে পুরোদমে বিপ্লবের মহড়া চলছিল। ফলে উদ্দেশ্য এক থাকলেও প্রতিটি দেশের গণসংস্কৃতির রূপ-রীতিতে পার্থক্য রয়েছে। অন্যদিকে ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের থেকেও বড়ো লড়াই চলছিল ওপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে। আবার স্বাধীনতার পরে গণনাট্য সংঘকে নতুন করে শত্রু চিনতে হয়েছে। ফলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রভাব ও অন্তরে সর্বহারার বিশ্বমানবতা থাকলেও গণনাট্য সংঘকে ভারতের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ একটি সন্তা আবিষ্কার করতে হয়েছিল। সরাসরি স্বীকার না করলেও সময়ান্তরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নীতি তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। গণনাট্য সংঘের বিভিন্ন সর্বভারতীয় সম্মেলন ও স্বাধীনোন্তর পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সন্মেলনগুলির আলোচনায় আমাদের আলোচ্য সময়কালের মধ্যে সংঘের তাত্ত্বিক চিত্রটি পরিস্কৃট হয়ে উঠবে।

১৯৩৬ সালে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলায় ১৯৪০ সালে YCI এবং ১৯৪১ সালে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' ও 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৩ সালের ২৫ মে প্রগতি লেখক সংঘের চতুর্থ সর্বভারতীয় সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে গণনাট্য সংঘের সূচনা হয়। এতগুলি সক্রিয় সংগঠন থাকা সত্ত্বেও পৃথকভাবে গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পড়েছিল। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতে তার কারণ,

"লেখকদের কারবার লিখিত শব্দ নিয়ে, তাঁদের আবেদন সীমাবদ্ধ শিক্ষিতদের মধ্যে। কিন্তু আমরা যারা গান গাইতাম, নাটক করতাম তাঁদের আবেদন এই নিরক্ষর দেশে অনেক ব্যাপক—জনতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের।"⁸²

অর্থাৎ গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ ছিল সংস্কৃতিকে শিক্ষিত মানুষের ঘেরাটোপ থেকে বের করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।

১৯৪৩ সালের ২৫ মে গণনাট্য সংঘের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জুলাই মাসে সম্মেলনের কার্যবিবরণী ও উদ্দেশ্য সম্মিলিত একটি বুলেটিন প্রকাশিত হয়। যার শুরুতেই লেখা ছিল, "people's Theatre Stars the People"। এই ইস্তাহারে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পালাবদলের ইতিহাসের সঙ্গে ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতির দৃঢ় যোগসূত্র নির্মাণের কথা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছিল। ইস্তাহারের 'historical background' অংশে বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতাগুলির অবক্ষয়ের মধ্যেও গণসংস্কৃতির অস্তিত্বরক্ষার ঐতিহ্য থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার আহ্বান জানানো হয়। ইস্তাহারে বলা হয় এই গণসংস্কৃতির বীজ তার বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতির মাধ্যমে ভারতবর্ষের মাটিকে পূর্ব থেকেই উর্বর করে রেখেছে। অথচ ঔপনিবেশিক শিক্ষা ও বুর্জোয়া অর্থনীতি আমাদের শ্রমিক-কৃষকের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। বর্তমান সময়ে গণনাট্য সংঘের কাজ হবে সেই সংস্কৃতিকে socialist realism-এর আলোয় উদ্ভাসিত করে পুনরায় 'গণ'-এর কাছে নিয়ে যাওয়া। তা করতে হবে পুরনো ঐতিহ্যকে 're-interpreting, adopting and integrating'-এর মাধ্যমে। সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের যৌথ আক্রমণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করে তুলছে, কৃষক-শ্রমিকের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে তাঁদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। গণনাট্য সংঘের কাজ হবে সমস্যার গভীরে পৌঁছোনো এবং সম্ভাব্য সমাধানের কথা শোনানো। যাতে মানুষ একত্রিত হয়ে একটি নতুন বিশ্বের সূচনা করতে পারে।⁸⁰ বুলেটিনে বলা হয়েছে,

"It is a movement which seeks to make of our arts the expression and the organizer of our people's struggles for freedom, economic justice and a democratic culture."⁸⁸

উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে হলে গণনাট্য আন্দোলন নিয়ে জনগণের কাছে পৌঁছোতে হবে। 'Draft Resolution'-এ যার স্বরূপ স্পষ্ট করে উল্লেখ করা আছে। গণনাট্যের শিল্পকলা হবে আনন্দমুখর, থাকতে হবে আশার বাণী। কিন্তু তা যেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্মত ও বাস্তব হয়। গণনাট্যের প্রযোজনা হবে সহজ ও স্পষ্ট। যাতে জনতার মধ্যে থেকে তার নিজস্ব নাট্যপ্রযোজনা উঠে

আসতে পারে। চেষ্টা করতে হবে গণনাট্যের প্রযোজনা যেন উন্মুক্ত মঞ্চে বা পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বিশ্ব-রাজনীতির মেলবন্ধনের জন্য লোকশিল্প ও গণসংগীতকে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যে ব্যবহার করতে হবে। রেজোলিউশনের বক্তব্য অনুযায়ী:

"It is the task of the Movement to enthuse our people to build up their unity and give battle to the forces ranged against them with courage and determination and in the company of the progressive forces of the world. It is our task to make this movement a means of spiritually sustaining our people in this hour of crisis and creating in them the confidence that as a united force they are invincible."⁸⁰

২৯ জুলাই গণনাট্য সংঘের সাধারণ সম্পাদক অনিল ডি'সিলভা কর্তৃক সুধী প্রধানকে পাঠানো একটি চিঠিতে বাংলা কমিটি নতুন করে গঠন করা হয়। নতুন কমিটিতে সুধী প্রধান মূল সংগঠক, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সভাপতি, শম্ভু মিত্র নাট্য প্রযোজক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সংগীত প্রযোজক এবং চিন্মোহন সেহানবীশ কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।^{8৬} সুধী প্রধান ও চিন্মোহন সেহানবীশ পার্টির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতেন। সোমনাথ লাহিড়ী, ভবানী সেনরাও গণনাট্য সংঘের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সম্পাদক পি সি যোশী পার্টি-নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতির সূচনায় যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ পরিকল্পনার 'মোবিলাইজার'।⁸⁴ হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতে, পি সি যোশী বুঝেছিলেন সংস্কৃতি সম্বন্ধে কমিউনিস্ট নেতাদের ধ্যানধারণা বুর্জোয়া আমলে পড়ে আছে। সংস্কৃতি যে লড়াইয়ের উপাদান হতে পারে, সে বিষয়ে কমিউনিস্ট নেতাদের ধারণা ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন উন্নতমানের শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে বিপ্লবী বক্তব্য জনসাধারণের কাছে সহজে পোঁছে দিতে। স্বাধীনতা সংগ্রাম, ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা, সমাজতন্ত্রের বাণী, শ্রেণিচেতনা প্রভৃতি রাজনৈতিক বক্তব্য একমাত্র গান বা নাটকের সাহায্যেই সাধারণ মানুষের কাছে পোঁছে দেওয়া সম্বর।^{8৮}

গণনাট্য সংঘ তথা সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিয়ে পি সি যোশীর সম্পূর্ণ ধারণাটি উঠে আসে ১৯৪৪ সালের পার্টি চিঠিতে প্রকাশিত 'কালচার ও কমিউনিস্ট' শিরোনামে একটি লেখায়। যেখানে সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, নাটকসহ বৃহত্তর কালচারাল ইউনিটের ভূমিকা ও গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়। চিঠিতে গণনাট্য সংঘের কেন্দ্রীয় কালচারাল স্কোয়াডের বোম্বাই সন্মেলনের কাজকর্মকে 'আমাদের' বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।^{৪৯} লেখাটিতে বলা হয় ভারতের কমিউনিস্টরা প্রথম দিকে সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্পর্কে উদাসীন থাকলেও ক্রমে 'কেন্দ্রীয় কালচারাল স্কোয়াড'-এর সাফল্যের পর তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে শুরু করেছে। মানুষ কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, শিল্পীদের পুরনো মূল্যবোধ ভাঙতে শুরু করেছে, পঞ্চম বাহিনী বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, সর্বোপরি শ্রমিক-কৃষকরা সংস্কৃতির প্রকৃত জাগরণী মন্ত্রকে ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে। আজকের সভ্যতার মতো সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও শ্রমিক-কৃষকরাই প্রকৃত স্রষ্টা। অথচ পুঁজিবাদীরা সংস্কৃতিকে কুক্ষিণত করে তাকে মুনাফার যন্ত্র করে তুলেছে। তাই আজকের দিনের কর্তব্য হবে বিপ্লবী সংস্কৃতি গড়ে তোলা এবং বিপ্লবের পর পুরনো সংস্কৃতিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা।

নতুন দিনের শিল্প গড়তে গেলে কমিউনিস্ট শিল্পীদের কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন গুণী শিল্পীদের আজকের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করানো, পার্টি সদস্যদের প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলা ও নিয়মিত চর্চা করা এবং নিজস্ব কালচারের অনুসন্ধান করা। যেমন বাংলার ক্ষেত্রে তথাকথিত 'ভদ্র-সংস্কৃতি' ও 'লোক-সংস্কৃতি'র সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণির সংস্কৃতির যোগসূত্র রচনা করতে হবে।^{৫১} এক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা হবে,

"পথ তৈরি করা, কোদাল কুপানো, মাটি কাটা, মাটি টানা,—বাংলার জনজীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, গুণী জীবনকে সচেতন করা। আর এজন্য চাই কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে কালচারাল ক্ষোয়াড এবং প্রত্যেক খানে সত্যিকারের উপযুক্ত কর্মীদের সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে সে কাজে নিযুক্ত করা।"^{৫২}

পার্টি শিল্পী-সাহিত্যিকদের তথ্য জোগাবে, শিল্পী তাঁর নিজের মতো করে রূপ দেবেন। পার্টি তাতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করবে না, কারণ শিল্পের দিকটি শিল্পীই ভালো বুঝবেন। তবে শিল্পীদেরও সচেতন থাকতে হবে যে 'সত্য'কে তুলে ধরতে গিয়ে স্লোগান আওড়ানো যাবে না। কারণ, শিল্পীর কাজ মানুষ নিয়ে, যে মানুষ কোনো বিশেষ আইডিয়া নয়, বরং অসংখ্য জটিল বিচিত্রতায়-ভালোবাসায়-দেশভক্তিতে-ভয়ে একজন Individual। কমিউনিস্ট পার্টি চেয়েছিল কয়েকটি শ্রেণিভিত্তিক সংগঠন গড়ে তুলতে, যেগুলি সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বামপন্থী মত প্রকাশের বাহক হবে, কিন্তু সরাসরি কমিউনিস্ট পার্টি হবে না।^{৫৩} প্রতিষ্ঠালগ্নে গণনাট্য সংঘ রাজনৈতিক পার্টি নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখেছিল। ১৯৪৩-র প্রথম বুলেটিনে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। ১৯৪৬-এর সম্মেলনে স্পষ্ট বলা হয়েছিল,

"সংগঠন হিসাবে আমরা কোনো রাজনৈতিক দলভুক্ত নই—আমাদের দেশের জনসাধারণের অংশ আমরা ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (আইপিটিএ নামেই সুপরিচিত)। তার সাংস্কৃতিক কাজের মধ্যে দিয়ে কোনো বিশেষ সংগঠন বা রাজনৈতিক দলের মতো প্রচারের যন্ত্র হিসাবে কাজ করবে না।"^{৫৪}

বিজন ভট্টাচার্য রচিত 'নবান্ন' নাটকের প্রযোজনা গণনাট্য সংঘের পরিকল্পনার পথপ্রদর্শকের কাজ করেছিল। ১৯৪৪ সালের ২৪ অক্টোবর শ্রীরঙ্গম মঞ্চে প্রযোজিত নাটকটির স্যুভেনিয়ারে বলা হয়েছিল যে সংঘের কাজ হবে গণসংযোগের মাধ্যমে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধশালী করে তোলা। স্তিমিতপ্রায় সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তুলে মানুষকে বৈপ্লবিক প্রাণশক্তিতে বলীয়ান করবে।^{৫৫} 'নবান্ন' নাটকের শেষে কৃষকরমণীর গান, মোরগ লড়াই আর গুরু গুরু মেঘের গর্জনের মধ্যে দয়ালের 'জোর প্রতিরোধ' ধ্বনিতে সমবেত সমর্থন গণনাট্য সংঘের আদর্শকে বাস্তবায়িত করে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী চেতনায় শহুরে দুর্ভিক্ষের চিত্র, সম্রান্ত মানুষদের অমানবিকতা, ডাক্তারের অসহায়তা উঠে আসে। গ্রামজীবনের চিরাচরিত সংস্কার আর আপন চেতনায় জাগ্রত প্রতিরোধের আহ্বানের দ্বন্দ্বে কৃষকরা শেষ পর্যন্ত নতুন স্বপ্ন দেখা শুরু করে। সুধী প্রধান 'নবান্ন' নাটক 'পার্টি লাইন' অনুসারে রচিত ও

সম্পাদিত^{৫৬} বলে উল্লেখ করলেও নাটকে বিজন ভট্টাচার্যের দেশজ অভিজ্ঞতা সঞ্জাত উদার মার্কসবাদী মানবিকতাই অধিক প্রাধান্য পেয়েছিল।

গণনাট্য সংঘের প্রথম তিনটি সম্মেলন বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৫ সালের তৃতীয় সম্মেলনে সংঘের সংবিধান তৈরি করা হয়। ১৯৪৬ সালে অনিল ডি'সিলভার রিপোর্টে সংস্কৃত নাটক ও লোকনাট্যের সঙ্গে আধুনিক নাট্যকলার সংমিশ্রণের প্রস্তাব দেওয়া হয়। মঞ্চব্যবস্থা, আলোর কৌশলসহ আঙ্গিকগত দিকগুলিতে জোর দিতে বলা হয়।^{৫৭} ১৯৪৬-এর ডিসেম্বরে গণনাট্য সংঘের চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। এ বছরের রিপোর্টে জানানো হয় যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সংগঠনের শাখাবিস্তার প্রয়োজন। যাতে গ্রামে-গঞ্জে অনুষ্ঠানের জন্য কলকাতার মুখাপেক্ষী না হতে হয়। লোকআঞ্চিককে যথার্থভাবে ব্যবহার না করার দুর্বলতাও তুলে ধরা হয়।^{৫৮}

স্বাধীনোত্তর সময়ে গণনাট্য সংঘের নীতি এবং এলাহাবাদ সম্মেলন :

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে। ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট গণনাট্য সংঘ ও কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ একসঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে।^{৫৯} এই সময়ে 'শহীদের ডাক' ছায়ানৃত্য ও 'অমর ভারত' (Immortal India) নৃত্যনাট্য খুব জনপ্রিয় হয়। ১৯৪৭-এর ২৬-৩১ ডিসেম্বর গুজরাটের আহমেদাবাদে গণনাট্যের পঞ্চম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদক নির্বাচিত হন নিরঞ্জন সেন। সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিরঞ্জন সেন জানান যে স্বাধীন ভারতে জাতীয় জীবনের আমূল পরিবর্তনের সঙ্গী হবে গণনাট্য সংঘ। সংঘ আপ্রাণ চেষ্টা করবে ভারতবর্ষকে গণতান্ত্রিক, সুখী ও সমৃদ্ধশালী গড়ে তুলতে। ভারতের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক জগতের বিখ্যাত ব্যক্তিদের একত্রিত করে গণনাট্য সংঘ নতুন দেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরি করার দায়িত্ব নেয়। বাংলার ক্ষেত্রে বলা হয় জেলায় জেলায় সংগঠন বিস্তারের যে পরিকল্পনা আগের সম্মেলনের

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল, তা ক্রমে সফল হচ্ছে। গত পাঁচ বছরের দুর্বলতা কাটিয়ে কয়েকমাসের মধ্যে 'নীচের তলা' থেকে অসংখ্য শাখা গড়ে উঠছে।^{৬০}

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই সমগ্র পরিস্থিতি বদলে যায়। ১৯৪৮-র জানুয়ারি মাসে সিপিআই-এর দ্বিতীয় সম্মেলনে প্রাপ্ত স্বাধীনতাকে বলা হল 'ঝুটা স্বাধীনতা'। প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য তেলেঙ্গানার মতো মুক্তাঞ্চল তৈরি করতে হবে। পি সি যোশীর বদলে নতুন সম্পাদক হন বি টি রণদিভে। বর্তমান নীতির প্রভাবে দু-মাসের মধ্যে সিপিআই-সহ সাতটি গণসংগঠনকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। পার্টির রাজনৈতিক সংকট গণনাট্য সংঘের সংগঠনে কীরকম প্রভাব ফেলেছিল, তার ইতিহাস আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা তৎকালীন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও গণনাট্য সংঘের নতুন আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করব।

কমিউনিস্ট পার্টির 'ঝুটা স্বাধীনতা' ও সশস্ত্র সংগ্রামের নীতি পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী বুদ্ধিজীবী মহলকে আড়াআড়িভাবে বিভক্ত করে দেয়। সিপিআই-এর অঘোষিত তাত্ত্বিক মুখপত্র 'মার্কসবাদী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া মতপার্থক্য ক্রমে রাজনৈতিক শত্রুতার পর্যায়ে নেমে যায়। বাম-বুদ্ধিজীবীর একাংশের পার্টি ও আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিকে পার্টির বর্তমান নীতির সাপেক্ষে দেখা শুরু হয়। ১৯৪৯ সালে সিপিআই নেতা ভবানী সেন ও বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রদ্যোৎ গুহ যথাক্রমে রবীন্দ্র গুপ্ত প্রকাশ রায় ছদ্মনামের আড়ালে 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' শিরোনামে দুটি আলাদা লেখা লেখেন। ভবানী সেন বাংলার সাজ ও সাহিত্যে রামমোহন, বন্ধিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র গুপ্ত প্র প্রতা বিরোধী প্রমাণ করে দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদনের ভূমিকাকে উচ্চাসনে বসান। তাঁর মতে বিবেকানন্দ ছিলেন 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু ফিউডাল শ্রেণির প্রতিনিধি'^{৬১}; বদ্ধিমের 'আবেদন শুধু গোঁড়া হিন্দুর কাছে'^{৬২}; রবীন্দ্রনাথ 'বুর্জোয়া', 'প্রতিক্রিয়াশীল' ও 'ধর্মগত সংকীর্ণ'^{৬৩}। তিনি আরও বলেন যে বামপন্থীদের কাছে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করেছিলেন পি সি যোশী। তাই বর্তমানে বামপন্থীদের পি সি যোশীর 'অমার্কসীয়' সাহিত্য চেতনা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।^{৬৪} এছাড়া অন্যান্য লেখায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, বিয্ণু দে-র লেখায় বামপন্থী সংগ্রামী চেতনার অভাব দেখিয়ে তাঁদের

দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুরু হয়। স্পষ্টতই সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ক্রমে 'পার্টি-লাইন'-এর রাশ দৃঢ় হতে থাকে।

১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে লেনিনগ্রাদে আন্দ্রেই ঝানভের (Andrei Zhdanov) বক্তৃতা ও 'On Literature, Music and Philosophy' গ্রন্থে তিনি বুর্জোয়া সংস্কৃতির সমন্ত চিহ্নকে মুছে দিতে বলেছিলেন। যারা আজও বুর্জোয়া সংস্কৃতির চর্চা করে চলেছে তাঁদের প্রত্যাঘাত ও আক্রমণ করা উচিত বলে তিনি মনে করতেন। ঝানভের মতো করে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনেক পার্টি-আমলা মনে করতেন শিল্প-সাহিত্যের নান্দনিক দিকটি গুরুত্বহীন, রাজনৈতিক উপযোগিতাবাদই শিল্প-সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য।^{৬৫} ঝানভের বক্তৃতার পর লেনিনগ্রাদের লেখক সভা থেকে কবি আনা আখমাতোভা ও জশচেন্ধোকে বহিষ্কার করা হয়। দুজনের বিরুদ্ধেই সোভিয়েতের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবক্ষয়ী মানসিকতাকে তুলে ধরার অভিযোগ ছিল।^{৬৬} এই সময়ে ফ্রান্সের দুই সাহিত্যিক লুই আরাগঁ (Louis Aragon) ও রজার গারোদির (Roger Garaudy) মধ্যে 'শিল্পে কমিউনিস্ট লাইন' বিষয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়। ঝানভের বক্তৃতার পর গারোদির পার্টি-লাইনহীন শিল্পকলার বদলে আরাগঁর লাইন স্বীকৃতি পায়।

বাংলায় গণনাট্য সংঘের মধ্যেও অতীতকে অস্বীকার ও বর্জন করার প্রবণতা দেখা দেয়। সংঘের এতদিনের মৌলিক অবস্থান নিয়েই প্রশ্ন তোলা শুরু হয়। 'নবান্ন' নাটকের সমস্ত গৌরবকে সরিয়ে রেখে নতুন করে সমালোচনা শুরু হয়। বলা হল নাটকটি কাঁদায়, কিন্তু ক্রোধ জাগায় না। কৃষকের ভাষায় কথা বলে, কিন্তু কৃষকের কথা বলে না। যে 'জোর প্রতিরোধ' ছিল স্বাধীনতা-পূর্ব গণনাট্যের মূল শ্লোগান তাকে 'অবাস্তব' বলা হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অনুপস্থিতি বা গাঁতায় খাটার সম্ভাব্য সমাধান সমালোচনা করে শ্রেণিসংগ্রামের অভাবকে কাঠগড়ায় তোলা হয়।^{৬৭} 'ভারতের মর্মবাণী' সম্পর্কে বলা হয় যে নৃত্যনাট্যটির বক্তব্য জওহরলাল নেহরু আবিষ্কৃত ভারতের প্রেতাত্মা। নৃত্যনাট্যটি শ্রেণিসমঝোতার বাণী ও শ্রেণিসাম্যের বাণী ব্যবহার করে এদেশে মার্কসবাদকে অচল করে দেওয়ার কথা বলেছে। ঘোষিত নীতি সত্ত্বেও গণনাট্য সংঘে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে না পড়তে পারার ব্যর্থতাকে ব্যঙ্গ করা হয়। বলা হয়, এর ফলে শ্রমিক-কৃষকরা 'নবান্ন', 'ভারতের মর্মবাণী'-র মতো

শ্রেণিচেতনা 'কলুষিত' করা শিল্প থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছে ।^{৬৮} 'লোকনাট্য' পত্রিকায় মৃত্যুঞ্জয় অধিকারী ছদ্মনামে সজল রায়চৌধুরী লেখেন যে স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে গণনাট্য আন্দোলন মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর আন্দোলন ছিল। মেকি জাঁকজমক ও আঙ্গিকের বুলিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে গণনাট্য শ্রমিক-কৃষকের কাছে পৌঁছোয়নি। শহুরে পেশাদার জগতের 'উন্নাসিক দাদারা' তাঁদের 'বিকৃত শিল্পচেতনা' দিয়ে গণনাট্য আন্দোলনকে বিপথে চালনা করেছে। গ্রামে যাওয়ার বদলে শহুরে বুদ্ধিজীবীদের বাহবা পাওয়ার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে।^{৬৯}

সজল রায়চৌধুরীর মতে বর্তমান কর্তব্য হল সংগঠনের নেতৃত্ব সরাসরি শ্রমিক-কৃষকদের হাতে আনতে হবে। শ্রমিক-কৃষক ও সংগ্রামী শিল্পীদের স্কোয়াড গঠন করে, তাদের শিল্পী-সাহিত্যিক দ্বারা বর্তমান লড়াইকে রূপদান করলে প্রকৃত গণশিল্প তৈরি হবে। যে স্কোয়াড শ্রমিক-কৃষকদের লড়াই চিনতে পারবে, ভালোবাসতে পারবে, রূপায়িত করতে পারবে তারাই সম্মান পাবে। এবং "আমাদের কাছে বিষয়বস্তু প্রথম, আঙ্গিক পরে। আমরা সমস্ত সংগ্রামী মানুষের জীবন ও লড়াইয়ের কথা প্রচার করব—রূপায়িত করব।"^{৭০} গণনাট্য কর্মী সুরপতি নন্দী ওই পত্রিকাতেই 'গণনাট্য সংগঠন ২' শিরোনামের লেখায় জানান যে গণনাট্যের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ট্রেড ইউনিয়ন, কিষাণ সভা, ছাত্র ফেডারেশনের আলোচনার মাধ্যমে নেওয়া প্রয়োজন। লোকশিল্পে অত্যধিক নজর দেওয়া উচিত। সর্বোপরি দরকার জনগণের মাঝে গিয়ে তার জীবন থেকে শিক্ষালাভ করা। আরেক ধাপ এগিয়ে চিন্মোহন সেহানবীশ 'সাহিত্য ও গণসংগ্রাম' প্রবন্ধে বলেন গণশিল্পীদের সবাইকে সৈনিক হয়ে আগে ফ্রন্টে যেতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন বা কিষান সভার মতো প্রকৃত সংগঠকের কাজ করতে হবে।^{৭১} তার ফলে যদি দু-চার বছর লেখা বন্ধ থাকে, তাহলেও ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। তাঁর ভাষায়,

"ইতিমধ্যে সেই কাজের মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর মানসিকতার ক্ষেত্রে পলি পড়বেই—আগামী দিনের সোনালি ফসলের যা নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। তাই বৈশাখের রুদ্রদাহ দেখে বিহ্বল না হয়ে ভরসা রাখতে হবে আষাঢ়ের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে।"^{৭২}

আরেকটি প্রবন্ধ 'শিল্প সাহিত্যের সমস্যা : চিনের পথ'-এ তিনি সাহিত্যের আবেদন ও শিল্পগত মহত্ত্বের জন্য জনপ্রিয়করণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। বিপ্লব চলাকালীন ও বিপ্লবোত্তর চিনের সাহিত্য-শিল্পের ইতিহাস তুলে ধরে তিনি বাংলার শিল্পীদের ব্যর্থতা তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকদের অধিকাংশই পেটি-বুর্জোয়া ভাবধারায় আক্রান্ত, তাই জনগণের রাজনৈতিক আকাজ্জাকে রূপ দিতে পারছে না। আর পেটি বুর্জোয়া মাপকাঠিতে সাহিত্যের রাজনৈতিক ও শিল্পগত গুণের সমন্বয় সম্ভব নয়।^{৭৩}

১৯৪৯-এ চিনে বিপ্লব সম্পন্ন হয় এবং একই আশায় ভারতেও সংগ্রামের পথ নির্মাণ করা হয়। গণনাট্যের নাট্যভাবনাতে মাও-জে-দং-এর ইয়েনান বক্তৃতা এবং লু স্যুনের সাহিত্যভাবনার প্রভাব পড়তে শুরু করে। লু স্যুন মনে করতেন পুরনো সাহিত্যে মানুষের প্রতি সহানুভূতি থাকলেও শেষ পর্যন্ত অত্যাচারীরই জয় হয়। আজকের সাহিত্যে বিলাপ পরিণত হবে হুঙ্কারে, প্রতিরোধের শক্তি দুর্বার-দুর্জয় হয়ে প্রতিশোধ নিতে চাইবে, ঘৃণা ও ক্রোধের চিহ্নু মেখে সমাজের বুকে বিপ্লব আছড়ে পড়বে। তিনিও বিপ্লবকালে সাহিত্যচর্চা স্থগিত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে এই সময়ে সমরসংগীত রচনা করা উচিত।^{৭৪} অন্যদিকে লু দিংয়ি তাঁর লেখায় বিপ্লবী সাহিত্যের এক নতুন রূপ তুলে ধরেন। যেখানে সৈনিকরা বন্দুকের কুঁদোয় গান লিখতেন, নিজেদের জীবনকাহিনি নিয়ে নাটক করতেন, মজুররা কারখানায় নিজেদের নাটক প্রযোজনা করতেন, লেখকরা চাষি আর সৈনিকদের মাঝে থেকে ভূমিসংস্কারের কাজ করতেন।^{৭৫}

১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এলাহাবাদে আয়োজিত গণনাট্য সংঘের ষষ্ঠ সম্মেলনের নীতি ছিল এই সার্বিক পরিস্থিতির ফসল। পার্টি-লাইন সমর্থনকারী শিল্পীদের প্রবর্তিত প্রকৃত সংগ্রামী সাহিত্যের রূপ ও তার উদ্দেশ্য নিয়ে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দেয় ষষ্ঠ সম্মেলন। নতুন সভাপতি হন কবি আন্নাভাই শাঠে, সম্পাদক পদে থাকেন নিরঞ্জন সেন। বাংলার দায়িত্ব দেওয়া হয় সজল রায়চৌধুরীকে। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত কিংবা বিমল রায়ের বদলে একজন হরিজন, শ্রমিক কবির সভাপতি পদ পাওয়া গর্বের বলেই হেমাঙ্গ বিশ্বাস মনে করেন।^{৭৬} তাঁর লেখা ষষ্ঠ সম্মেলনের রিপোর্ট 'পরিচয়' পত্রিকায় ছাপা হয়।

ষষ্ঠ সম্মেলনের মূল প্রস্তাবে বলা হয় পৃথিবীর শিল্পসাহিত্য আজ দুই শিবিরে বিভক্ত। একদিকে আমেরিকান পুঁজিবাদ সম্বলিত ক্ষয়িষ্ণু, সমাজ-নিরপেক্ষ সাহিত্য, অন্যদিকে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শোষিতদের মুক্তির জন্য রচিত সংগ্রামী সাহিত্য। গণনাট্য সংঘ শ্রমিক-কৃষক-সংগ্রামী মধ্যবিত্তের জন্য শিল্পসৃষ্টি করবে। তাই গণনাট্য সংঘ কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলভুক্ত না হলেও দলীয় শিল্পী-সংগঠন রূপেই কাজ করবে। মধ্যবিত্ত শিল্পীদের কবল থেকে বের করে এনে গণনাট্যের কাঠামো গড়তে হবে নিচুতলা থেকে। 'জঙ্গি-মজুর' ও কৃষক-আন্দোলনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রাথমিক ইউনিট গড়ে উঠবে, তাঁদের প্রতিনিধি দ্বারা উচ্চস্তরের কমিটিগুলি গঠন করা হবে। সংঘের প্রত্যেক কর্মীকে সংগ্রামী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক সৈনিক হওয়ার পাশাপাশি বৃহত্তর গণআন্দোলনের সৈনিক হয়ে উঠতে হবে।^{৭৭} সক্ষম নেতৃস্থানীয়রা গণআন্দোলনে যুক্ত হবে। বাকিরা ক্ষোয়াডগুলিকে গণসংগঠনের আঞ্চলিক শাখারপে চালাবেন—আলাদা করে গান বা নাটকের বিভাগ থাকবে না। তাতে যদি কোয়াডের গুণমান ক্ষুপ্ণ হয়, তাও গণআন্দোলনের স্বার্থে মেনে নিতে হবে।^{৭৮} যাঁরা সংঘ ছেড়ে চলে গেছে, তাঁদের 'রসশোসক পরগাছা নির্মূল' বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।^{৭৯}

গণনাট্য সংঘের ষষ্ঠ সর্বভারতীয় অসংখ্য বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। গণনাট্যের প্রতিষ্ঠাকালীন উদ্দেশ্য, অর্থাৎ 'গণ'-এর কাছে যাওয়ার লক্ষ্য স্থির থাকলেও পদ্ধতি ও কর্তব্য আমূল বদলে যায়। পার্টি-নীতির কারণে সংঘের উপরে রাজনৈতিক আক্রমণ শুরু হয়, সংগঠনের নেতাদের জেলবন্দি করা হয়, 'গণতান্ত্রিক' শিল্পীদের দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়, উগ্র ও সংকীর্ণ আচরণের জন্য জনসাধারণের থেকে দূরত্ব তৈরি হয়। বাংলার সাংগঠনিক ব্যবস্থা পুরো ভেঙে পড়ে। আবার এই সময়েই অনেক নতুন প্রতিভাশালী মুখ গণনাট্য সংঘে যুক্ত হন। স্বাধীনতা-পূর্ব নাটকে কৃষক বা শ্রমিক সংগ্রামের কাহিনি উঠে আসেনি, মধ্যবিত্তের সংগ্রামী ভূমিকাকেও ছোটো করে দেখা হয়েছিল। প্রতিকূল রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যেও অসংখ্য নাটক প্রযোজিত হয়। তেভাগার খাসভূমি ডোঙাজোড়াসহ অসংখ্য গ্রামে-গঞ্জে গণনাট্যের নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রকৃত অর্থে 'গণ'-এর কাছে যাওয়ার রাজনৈতিক সচেতনতা দেখা দেয়। মঞ্চব্যবস্থা, আলো, প্রপসের আঙ্গিকগত গুরুত্ব কমে সংগ্রামী বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় অধিক জোর দেওয়া হয়। এই সময়েই পানু পালের পরিকল্পনায় পথ নাটক

ও পোস্টার নাটকের প্রচলন শুরু হয়। জেলায়-জেলায় শাখাবিস্তার শুরু হয়, যদিও পরিস্থিতির প্রভাবে সেগুলি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। পরে ষষ্ঠ সম্মেলনের নীতি বাতিল হয়ে গেলে এই শাখাগুলিকে উজ্জীবিত করে জেলায় গণনাট্যের কাজ শুরু হয়। এই সব কারণে হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলেছিলেন, "আমার দৃষ্টিকোণ হল যে তেলেঙ্গানার পর IPTA তিন বৎসর—সেটা আমি বলব গণনাট্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।"^{৮০}

পাঁচের দশকে গণনাট্য সংঘের সম্মেলন এবং তাত্ত্বিক অবস্থান :

১৯৫১ সালের ৫ জানুয়ারি কমিউনিস্ট পার্টির নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। তার কিছুদিন আগেই রাশিয়ার কমিনফর্ম দলিলে ভারতের পার্টি-নীতির সমালোচনা করা হয়েছিল। পার্টির মধ্যে আত্মসমালোচনা শুরু হয়। ফলস্বরূপ ১৯৫১ সালের ৯-১৫ অক্টোবর সিপিআই-এর সর্বভারতীয় সম্মেলনে রণদিভে প্রবর্তিত নীতি বাতিল করা হয়। নতুন সম্পাদক হন অজয় ঘোষ।

বাংলার বাম-সাংস্কৃতিক মহলে 'ঝুটা স্বাধীনতা'-র সংগ্রামী নীতির ব্যাপক প্রভাব ছিল। গণআন্দোলনের সঙ্গে গণনাট্য সংঘকে এক করে দেখার ফলে পার্টির সঙ্গে সংঘের যে দূরত্ব ঘোষণা করা হয়েছিল, তার আর কোনো মূল্য থাকেনি। সজল রায়চৌধুরী জানাচ্ছেন যে এরপর মানুষকে আর বোঝানো যায়নি যে গণনাট্য সংঘ 'স্বনিয়ন্ত্রিত' সংগঠন।^{৮১} ১৯৫২ সালে ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে গণনাট্য সংঘ সরাসরি পার্টির হয়ে ভোটপ্রচারে নামে। অন্যদিকে ভেঙে পড়া গণনাট্য সংঘক নতুন করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পার্টি-সংগঠনকে ব্যবহার করা ছাড়া উপায় ছিল না। ১৯৫০ সালে পার্টি আইনি হওয়ার আগে আত্মসমালোচনা কালে শ্যামবাজারের বঙ্গীয় কলালয়ে আটদিন ব্যাপী একটি মিটিং হয়। সংঘের সর্বভারতীয় সম্পাদক নিরঞ্জন সেনও মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। নতুন সংগঠন, প্রয়োগরীতি ও আদর্শের সন্ধান নিয়ে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়। অবশেষে সংঘকে 'ডি-

১৯৫১ সালে গণনাট্যের প্রাদেশিক খসড়া প্রস্তুত কমিটি ঋত্বিক ঘটককে মূলনীতির খসড়া লেখার দায়িত্ব দেয়। সারা রাজ্য থেকে আগত গণনাট্য কর্মীদের প্রশ্ন ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঋত্বিক ঘটক খসড়াটি তৈরি করেন। খসড়ায় বলা হয় 'ঝুটা স্বাধীনতা'র কালে সংঘ 'মধ্যবিত্ত সুলভ অতি বিপ্লববাদ বাস্তবতা'য় আক্রান্ত হয়ে বন্ধুকে শক্রু করে তুলেছিল এবং মজুর-কৃষকের স্বার্থকেই বিসর্জন দিয়েছিল। শিল্পকে জিগিরে পরিণত করে তিল তিল করে গড়ে তোলা গণনাট্য আন্দোলনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া দিয়েছিল।^{৮৩} তাই এখন কর্তব্য গণনাট্যের আদর্শে উজ্জীবিত বলিষ্ঠ জীবনবাদী ধারা ব্যবহার করে প্রযোজনাগত বিকৃত রূপ মুছে দিয়ে সামাজিক মূল্য জনতার কাছে তুলে ধরা। তার সঙ্গে যাত্রা, পালাগান, গম্ভীরার মতো লোকসংস্কৃতির থেকে সামন্তবাদী চেতনা বাদ দিয়ে তাকে নতুন ধারার সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা উচিত।^{৮৪} যে কোনো শিল্পকর্ম হতে হবে বিষয় ও রূপরীতির সার্থক সমন্বয়ের ফল। জনপ্রিয়তাকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে, কিন্তু জনপ্রিয়তার মাপকাঠি নির্মিত হবে উৎকৃষ্টতার নিরিখে।^{৮৫}

১৯৫২ সালে নৈহাটি কনভেনশনে এ রাজ্যে সংঘের প্রাদেশিক কেন্দ্র স্থাপন ও শাখাবিস্তারের কাজ শুরু হয়। সভাপতি হন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং সম্পাদক কমল মিত্র। ১৯৫৩ সালে সংঘের সপ্তম সর্বভারতীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্তে সভাপতি হন বিমল রায় এবং সম্পাদক পদে পুনর্বহাল থাকেন নিরঞ্জন সেন। সপ্তম সম্মেলনের সংবাদ ও উদ্দেশ্য জানিয়ে 'পরিচয়' পত্রিকায় একটি রিপোর্ট লেখেন নিরঞ্জন সেন। সপ্তম সম্মেলনের সংবাদ ও উদ্দেশ্য জানিয়ে 'পরিচয়' পত্রিকায় একটি রিপোর্ট লেখেন নিরঞ্জন সেন। সেখানে তিনি জানান যে বর্তমানে গণনাট্য সংঘ জনবিচ্ছিন্ন, সংকীর্ণতায় জীর্ণ এবং শিল্পমানের প্রতি অবহেলায় আক্রান্ত। এই সম্মেলন উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে অগ্রগমনের পথ করে নেওয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।^{৮৬} এপ্রিল মাসে সংঘের সর্বভারতীয় মুখপত্র 'ইউনিটি' (Unity) পত্রিকায় সম্পাদক ডেভিড কোহেন 'For A People's Theatre' শিরোনামে সপ্তম সম্মেলনের খসড়া তৈরি করেছিলেন। সেই লেখায় অতীতের সমৃদ্ধ সাহিত্য ঐতিহ্যকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়ার কথা বলা হয়। পাশাপাশি গণনাট্যের বৃহত্তর আদর্শে ভারতের সকল থিয়েটারকর্মী, সংগঠক, শিল্পী-সাহিত্যিকদের একত্রে জাতীয় বৈশিষ্টযুক্ত নাট্যসংস্কৃতি নির্মাণের

আহ্বান জানানো হয়।^{৮৭} সম্মেলনের পরে 'পরিচয়' পত্রিকায় নিরঞ্জন সেন গণনাট্যের নতুন আদর্শ সম্বন্ধে লেখেন,

"দুর্বল আর অসার্থক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যর্থতা থেকে এই কথাটাই স্পষ্ট হয়েছে যে সংগীত-নাটক-নৃত্য ইত্যাদির বিষয়বস্তুটা যতই ভালো হোক না কেন, আর্ট হিসেবে তাকে শিল্প রসোত্তীর্ণ করে তুলতে না পারলে সেটা কোনো তাৎপর্য পাবে না, জনসাধারণকে তা অনুপ্রাণিত করতে পারবে না। বিষয়বস্তুর বাস্তব বলিষ্ঠতা আর শিল্পগত রসোত্তীর্ণতা— এই দুইয়ের উপযুক্ত সমন্বয়েই আর্টের গণমুখাপেক্ষী সার্থকতা।"^{৮৮}

১৯৫৩ সালের IPTA Manifesto-তে বলা হয়েছিল গণনাট্য জীবন সংগ্রাম, শান্তি, গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য লড়াই করবে এবং সবরকম অবিচারের বিরুদ্ধে শিল্প সৃষ্টির কাজে ব্রতী হবে। এদেশের মহান জনগণের সুখ-দুঃখের গান গাইবে, বাস্তবসম্মত চিত্র অঙ্কণ করে তাঁদের এক ঐশ্বর্যপূর্ণ জীবনের সন্ধান দেবে। গণনাট্য ভারতের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সমানাধিকার দাবি করে এবং মাতৃভাষাকেই শৈল্পিক ও জাতীয় জীবনের উন্নতিতে সর্বোচ্চ স্থান দেয়। সংঘ আজও যুদ্ধের তীব্র বিরোধিতা করে। সমগ্র ভারতের শিল্পীদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্য ব্যবহারের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক জীবনকে পরিপূর্ণ এবং দেশকে সমৃদ্ধশালী করে তোলার জন্য আহ্বান জানানো হয়।^{৮৯}

সংঘের খসড়া প্রস্তাব বা ম্যানিফেস্টোর আলোচনা থেকে বোঝা যায় এলাহাবাদ সম্মেলনের নীতিকে প্রত্যাখ্যান করা হয় এই সম্মেলনে। কিন্তু শৈল্পিক মানোন্নয়ন বা জাতীয় সংস্কৃতি তৈরির বিষয়ে যতটা জোর দেওয়া হয়েছিল, রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা ও সংগ্রামী শ্রেণির প্রতি মমত্ব প্রসঙ্গ তত বাক্যব্যয় করা হয়নি। পুরনো নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার তাগিদ এতটাই তীব্র ছিল যে সংঘের নতুন নীতিতে অনেক অস্পষ্টতা, জটিলতা রয়ে গেল। কেন্দ্রীয় সরকারের সংগীত-নাটক-আকাদেমির সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার প্রস্তাবও এই সম্মেলন থেকেই উঠে আসে।

সেই সময়ে গণনাট্যের তৎকালীন সর্বভারতীয় সম্পাদক নিরঞ্জন সেন পার্টি নেতৃত্বকে একটি নোট লেখেন। যেখানে তিনি গণনাট্য সংঘকে 'মার্কসবাদী আদর্শে পরিচালিত' সংগঠন বলে উল্লেখ করেন। যার উদ্দেশ্য ভারতের সমস্ত শিল্পীদের ঐক্যবদ্ধ করে গণশিল্প সৃষ্টি করা। তিনি জানান, ভারতবর্ষের মতো গ্রামীণ সমাজকেন্দ্রিক আধা-ঔপনিবেশিক দেশে গণনাট্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এদেশের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর, যারা লোকআঙ্গিকের মাধ্যমে তাঁদের বিনোদন খুঁজে পান। গণনাট্যের কাজ লোকআঙ্গিকগুলিকে মতাদর্শের লড়াইয়ে ব্যবহার করা, রক্ষা করা, বিকশিত করা। অন্যদিকে শহুরে শ্রমিকশ্রেণি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে থিয়েটারের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে জনমনের শক্তিকে দুর্জয় করে তোলা। কংগ্রেস সরকারের অত্যাচার ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের অগ্রগতি, গণসংস্কৃতির উত্থানে গণনাট্য সংঘ হয়ে উঠবে ভাবাদর্শের হাতিয়ার।

সপ্তম সম্মেলনের পর থেকেই গণনাট্য সংঘের মধ্যে ক্রমে দুটি পৃথক ধারার অস্তিত্ব অনুভূত হতে থাকে। সম্মেলনের যাবতীয় সিদ্ধান্ত-বিতর্কের বিষয়ে অঞ্জন বেরার পর্যালোচনা, "বাম-সংকীর্ণতাবাদ থেকে আইপিটিএ আবার দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদী পথে পা দিচ্ছে।"^{৯০} ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের গণনাট্য সংঘের প্রথম রাজ্য সম্মেলনে সর্বভারতীয় নীতির প্রভাব থাকলেও প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলন বা শ্রেণিসংগ্রামের মতো বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়নি। সম্মেলনের বুলেটিনে বলা হয় 'যা কিছু মহৎ শিল্প সৃষ্টি তা-ই জনগণের সম্পদ'। যেহেতু আজকের সময়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ষড়যন্ত্র মানুষের জীবনকে বিপর্যন্ত করে তুলেছে, তাই গণনাট্য সংঘ তার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে। তার সঙ্গে গণনাট্য এমন শিল্প সৃষ্টি করতে চায় যা মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সমন্বয়কে বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করবে।^{৯১} কিন্তু দুই মতাদর্শের দ্বন্দ্বে রাজ্যে গণনাট্যের কাজকর্মে শিখিলতা আসতে থাকে।

১৯৫৭-৫৮ সালে গণনাট্য সংঘের অষ্টম সর্বভারতীয় সম্মেলনের নীতি ঘিরে ফের বিতর্ক মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তার আগের বছরেই গণনাট্য সংঘ কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃতি পেয়েছে। সম্মেলন থেকে সংগীত নাটক আকাদেমির স্বীকৃতিকে স্বাগত জানিয়ে বলা হয় এই সিদ্ধান্ত নতুন দিনের সূচনা করবে। আকাদেমিকে অনুরোধ করা হয় তাঁরা যেন গণনাট্য সংঘকে ব্যবহার করে

দেশের সাংস্কৃতিক চেতনার স্তরকে উন্নত করে তোলেন।^{৯২} সংঘের দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করা হল। সম্মেলনে প্রস্তুত হওয়া নতুন ঘোষণাপত্রে বলা হল এই মুহূর্তে গণনাট্য সংঘ কাজ করবে,

"For the free flowering of arts; For full freedom of artistic expression;

for the best training of artists and technicians."³⁰

ম্যানিফেস্টোতে জনতার সংগ্রামী শক্তির পাশে দাঁড়ানো বা গণআন্দোলনের সঙ্গী হওয়ার বিষয়টিকে প্রায় অগ্রাহ্য করা হয়। সিপিআই-এর মধ্যেও তখন আদর্শগত সংঘাত ব্যাপক আকার ধারণ করতে শুরু করেছে। নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাজতন্ত্র, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর শ্রেণিচরিত্র, বিভিন্ন ফ্রন্ট গঠনের পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয় তখন সিপিআই নেতৃত্বের মূল আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। গণনাট্যের সর্বভারতীয় সন্দ্রেলনের রিপোর্ট দেখলে তার প্রভাব অস্বীকার করার উপায় থাকে না। এর পরেই গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় কাঠামোটি ভেঙে যায় এবং আর কোনো সর্বভারতীয় সন্দ্রেলন অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৫৮ সালে সংঘের দ্বিতীয় রাজ্য সন্দ্রেলনে সাধারণ সম্পাদক সজল রায়চৌধুরীর রিপোর্টে শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষকে গণনাট্যের 'নায়ক' বলা হয়। তিনি শিল্পীদের জীবিকা ও লোকশিল্পের সমৃদ্ধির জন্য সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। জাতীয় ঐতিহ্য ও বিশ্বব্যাপী নাট্য-আন্দোলনের শিক্ষা নিয়ে শিল্প প্রযোজনায় বাস্তব জীবনবোধের প্রয়োগ করার কথা এই রিপোর্টে বলা হয়।^{৯৪}

ক্রমে সিপিআই-এর মধ্যে ভাঙন সুনিশ্চিত রূপ নেয়। ১৯৬২ সালে অবিভক্ত সিপিআই-এর সময়ে গণনাট্য সংঘের শেষ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর পরে চিন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের জেরে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহলের অচলাবস্থার মধ্যে গণনাট্য সংঘে ভাঙন নেমে আসে। ১৯৬৪ সালে সিপিআই(এম) গঠনের পর রাজ্যে গণনাট্য সংঘের কাজকর্ম নতুন উদ্যমে শুরু হয়। গণনাট্যের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সুধী প্রধানের মতে গণনাট্যের আজকের সমস্যা সাংগঠনিক নয়, আদর্শগত। যে সমস্যা ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলনকেও দ্বিধাগ্রস্ত করেছে। তাই

আজকের দিনে গণনাট্য ও তার প্রভাবাধীন সংগঠনগুলিকে মার্কসবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শ্রেণিচরিত্র অবলম্বন করে চলা উচিত।^{৯৫} তবে সংঘকে সম্পূর্ণ পার্টি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত করার তিনি বিরোধী ছিলেন। ১৯৬৭ সালে গণনাট্য সংঘের তৃতীয় রাজ্য সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে বলা হয় গণনাট্য সংঘ বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী জীবনদর্শনের আলোকে শিল্প সৃষ্টি করবে। তাই নাট্যকারদের কাহিনি বা উপাদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে মানুষের শ্রেণিসংগ্রাম এবং সামাজিক ঘটনার উত্থান-পতন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের আবেদন জানানো হয়। ঘোষণাপত্রের বক্তব্য অনুযায়ী,

"আগামী দিনে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার ভিত্তিতে এক নতুন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটছে। সে সংস্কৃতি সামন্ততন্ত্র, একচেটিয়া পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনগণতান্ত্রিক সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতির সম্ভাবনা ও বিকাশকে মূর্ত করে তোলার সংগ্রামে আমরা একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করব।"^{৯৬}

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের তত্ত্বচর্চার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দীর্ঘ দলিল। বিদেশি নাট্য-আন্দোলন ও নাট্যাদর্শ যেমন তাকে অনুপ্রাণিত করেছে, তেমনই প্রতিভাশালী নাটককারের হাতে দেশীয় লোকআঙ্গিক শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে উঠেছিল। আবার সম্মেলন থেকে সম্মেলনে সংঘের নাট্যাদর্শে ধারাবাহিক পরিবর্তন এসেছে। সব মিলিয়ে গণনাট্য চেয়েছিল শোষিত মানুষের মুক্তিচেতনার দ্যোতক হয়ে উঠতে। রাজনীতির সঙ্গে নাট্যতত্ত্বের সার্থক মিলন সেই মুক্তির পথ ও পদ্ধতির সন্ধান দিতে পারত। কিন্তু আমাদের আলোচ্য সময়কালে গণনাট্য সংঘের অধিকাংশ নাটকই তত্ত্ব, রাজনীতি ও পার্টি নিয়ন্ত্রণের নিগূঢ় বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা গণনাট্যের শিল্পী ও শিল্প-চেতনার সঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শের দ্বন্দ্ব আলোচনা করব।

তথ্যসূত্র :

- ১ · Sudhi Pradhan (Editor); Marxist Cultural Movement in India (MCMI), Vol. 1, National Book Agency, Calcutta, 1985, প্- ১৫৯
- ২। আ. ইয়ের্মাকোভা, ভ. রাত্নিকভ; শ্রেণি ও শ্রেণিসংগ্রাম (অনুবাদ- ননী ভৌমিক), প্রগতি প্রকাশন, মক্ষো, ১৯৮৮, পৃ- ৫০
- ৩। হীরেন ভট্টাচার্য; সংস্কৃতি ভোগবাদ ও মূল্যবোধ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০, পৃ- ৩৪
- ৪। সুধী প্রধান; গণনাট্য আন্দোলনের ঐতিহ্য, গণনাট্য পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, শারদীয় সংকলন, ১৩৭১, পৃ- ১০৩
- ৫। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; নাট্যচিন্তা শিল্পজিজ্ঞাসা, ইম্প্রেসন সিন্ডিকেট, ১৯৭৮, মুখবন্ধ, ড
- ৬। সলিল সেন; নবনাট্যের সংজ্ঞা, আজকের নাটক ও নবনাট্য আন্দোলন, (সম্পাদনা- সুনীল দত্ত), জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, পৃ- ২৬
- ۹ https://www.marxists.org/archive/marx/works/1888/letters/88_04_15.htm
- b https://www.marxists.org/archive/marx/works/1888/letters/88_04_15.htm
- ৯। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য; মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব, অবভাস, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ- ৫৭
- ১০। অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র; মার্কসীয় আর্টতত্ত্ব ও লেখকের স্বাধীনতা, পরিচয়, ২৮ বর্ষ, বৈশাখ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, পৃ- ৭৫২
- ১১। ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়; মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮, পৃ- ৩১
- ১২। কল্পতরু সেনগুপ্ত; নাটকের সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম, গণনাট্য পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ, জুলাই-অক্টোবর ১৯৬৭, পৃ- ৩২
- ১৩। প্রাগুক্ত, নাট্যচিন্তা শিল্পজিজ্ঞাসা, পৃ- ৫
- ১৪। সমুদ্র গুহ; প্রতিরোধের নাটক, আর বি এন্টারপ্রাইজেস, ২০২১, পৃ- ২৬-২৭
- ১৫। অন্জন্ দাশগুপ্ত; গ্রুপ থিয়েটার, থিয়েটার, প্রথম খণ্ড, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, ২০০২, পৃ- ১৬৫

১৬। প্রাগুক্ত, মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব, পৃ- ১৩৯

- ১৭। প্রাগুক্ত, প্রতিরোধের নাটক, পৃ- ৫
- ১৮। রথীন চক্রবর্তী; গননাট্য আন্দোলনের ইস্তাহার, পিপলস থিয়েটার, রম্যাঁ রলাঁ (অনুবাদ ও সম্পাদনা- রথীন চক্রবর্তী), পুস্তক বিপণি, পু- ৫
- ১৯। প্রাগুক্ত, পিপলস থিয়েটার, থিয়েটার, প্রথম খণ্ড, পৃ- ১১২-১১৩
- ২০। প্রাগুক্ত, গননাট্য আন্দোলনের ইস্তাহার, পিপলস থিয়েটার, পৃ- ১৫
- ২১। প্রাগুক্ত, পিপলস থিয়েটার, পৃ- ১১৮
- ২২। তদেব, পৃ- ১৪১
- ২৩। তদেব, পৃ- ১৪১
- ২৪। উৎপল দত্ত; রোমাঁ রোলাঁর গণনাট্য, গদ্য সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮, পূ- ৫৪১
- ২৫। প্রাগুক্ত, গননাট্য আন্দোলনের ইস্তাহার, পিপলস থিয়েটার, পৃ- ৭
- ২৬। প্রাগুক্ত, পিপলস থিয়েটার, পৃ- ১২৩
- ২৭। প্রাগুক্ত, পিপলস থিয়েটার, থিয়েটার, প্রথম খণ্ড, পৃ- ১১৭
- ২৮। প্রাগুক্ত, Marxist Cultural Movement in India (MCMI), Vol. 1, পৃ- ১৬১-১৬২

২৯। তদেব, পৃ- ১৬২

৩০। তদেব, পৃ- ১৬৮-১৬৯

৩১। তদেব, পৃ- ১৭২

৩২। লু-দিংয়ি; নতুন চিনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি, পরিচয়, নবপর্যায় ৫ সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭, পৃ-

- ৩৩। মাও জে দং; সাহিত্য ও শিল্প প্রসঙ্গে ইয়েনানের আলোচনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ, মাও জে দং রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৬০, পৃ- ১০০
- ৩৪। তদেব, পৃ- ১০৫
- ৩৫। তদেব, পৃ- ১০৫

- ৩৬। তদেব, পৃ- ১০৭
- ৩৭। তদেব, পৃ- ১০৮
- ৩৮। তদেব, পৃ- ১১৭
- ৩৯। তদেব, পৃ- ৯২
- ৪০। তদেব, পৃ- ১১৭
- 8১। হেমাঙ্গ বিশ্বাস; অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক যুক্তফ্রন্টের স্বরূপ ও সমস্যা, তিন দশকের গণআন্দোলন, (সম্পাদনা- অনিল আচার্য), অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০১৮, পৃ- ৩২
- ৪২। হেমাঙ্গ বিশ্বাস; গণনাট্য আন্দোলনে আমার গান, উজান গাঙ বাইয়া, অনুষ্টুপ, ২০১৮, পৃ- ৯৭
- ৪৩। প্রাগুক্ত, Marxist Cultural Movement in India (MCMI), Vol. 1, পৃ- ১২৯
- ৪৪। তদেব, পৃ- ১২৯
- ৪৫। তদেব, পৃ- ১৩১
- ৪৬। তদেব, পৃ- ১৭৬
- ৪৭। প্রাগুক্ত, হেমাঙ্গ বিশ্বাস-কল্পনা বিশ্বাস সাক্ষাৎকার, উজান গাঙ বাইয়া, পৃ- ২২২
- ৪৮। তদেব, পৃ- ২২৮
- ৪৯। অনিল বিশ্বাস (সম্পাদনা); কালচার ও কমিউনিস্ট, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯, পৃ- ২৫০
- ৫০। তদেব, পৃ- ২৫১
- ৫১। তদেব, পৃ- ২৫৩
- ৫২। তদেব, পৃ- ২৫৩
- ৫৩। প্রাগুক্ত, গণনাট্য আন্দোলনের ঐতিহ্য, গণনাট্য পত্রিকা, পৃ- ১০৩
- ৫৪। জনসাধারণই গণনাট্যের নায়ক, 'শহীদের ডাক' অভিনয়পত্রী, ১৯৪৭, পৃ- ৫
- ৫৫। সুধী প্রধান; নব সংস্কৃতি ও গণনাট্য প্রসঙ্গে, নাট্য আন্দোলনের তিরিশ বছর (সম্পাদনা- সুনীল

দত্ত), জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮৭, পৃ- ১৭

- ৫৬। সুধী প্রধান; 'নবান্ন' ও ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলন, নবান্ন, বিজন ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪, পৃ- ১২৬
- ৫৭। প্রাগুক্ত, Marxist Cultural Movement in India (MCMI), Vol. 1, পৃ- ২৪১
- ৫৮। তদেব, পৃ- ২৫৮
- ৫৯। অঞ্জন বেরা; পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর, গণনাট্য প্রকাশনী, ২০১৭, পৃ- ৭৩
- ৬০। তদেব, পৃ- ৭৫
- ৬১। রবীন্দ্র গুপ্ত; বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (সম্পাদনা-ধনঞ্জয় দাশ), নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, ১৯৬০, পৃ- ৯২
- ৬২। তদেব, পৃ- ৮৮
- ৬৩। তদেব, পু- ১০১-১০২
- ৬৪। তদেব, পৃ- ১২০
- ৬৫। প্রাগুক্ত, মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব, পৃ- ৮৭
- ৬৬। বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য; বাঙালি সংস্কৃতিতে সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাব ও অন্যান্য, লোক সেবা শিবির, 2020, 7- 68
- ৬৭। ধনঞ্জয় দাশ; বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা, মার্কসীয় সাহিত্য-সমালোচনার সমস্যা, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, ১৯৫৭, পৃ- ২০৮
- ৬৮। তদেব, পৃ- ২০৯

৭০। তদেব, পু- ২৩২

পূ- ৭৯

- ৬৯। মৃত্যুঞ্জয় অধিকারী; গণনাট্য সংগঠন ১, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক ২ (সম্পাদনা- ধনঞ্জয় দাশ),
 - নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, পৃ- ২২৭-২২৮
- ৭১। চিন্মোহন সেহানবীশ; ৪৬ নং—একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে, সেরিবান, কলকাতা, ২০১৫,

- ৭২। তদেব, পৃ- ৭৮
- ৭৩। তদেব, পু- ৮৬
- ৭৪। লু স্যুন; বিপ্লবের যুগের সাহিত্য, শিল্পীর আয়ুধ : সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা (সম্পাদনা- অরবিন্দ পোদ্দার), বুকমার্ক, অক্টোবর ১৯৮২, প- ৭৬
- ৭৫। প্রাগুক্ত, নতুন চিনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি, পরিচয়, পৃ- ৪৪
- ৭৬। প্রাগুক্ত, গণনাট্য সংঘ বনাম গণনাট্য আন্দোলন, উজান গাঙ বাইয়া, পৃ- ১৪৭
- ৭৭। হেমাঙ্গ বিশ্বাস; গণনাট্য সম্মেলন, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক ৩ (সম্পাদনা- ধনঞ্জয় দাশ), নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, ১৯৫৮, পৃ- ৪৪০
- ৭৮। সুনীল দত্ত (সম্পাদনা); নাট্য আন্দোলনের তিরিশ বছর, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮৭, পৃ-৩৩

৭৯। তদেব, পৃ- ৩৬

৮০। প্রাগুক্ত, হেমাঙ্গ বিশ্বাস-কল্পনা বিশ্বাস সাক্ষাৎকার, উজান গাঙ বাইয়া, পৃ- ২৬৫

- ৮১। সজল রায়চৌধুরী; ৬৪ পূর্ববর্তীকালের সৃষ্ট গণনাট্যের নাটক : রচনা ও প্রযোজনার বৈশিষ্ট্য, গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর (সম্পাদনা- বাবলু দাশগুপ্ত ও শিবশর্মা), গণনাট্য সংঘ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৯৩, পৃ- ১৬৭
- ৮২। সুনীল দত্ত; স্রোতের বিরুদ্ধে ঋত্বিক, নাট্যস্মৃতি : পঞ্চাশ বছর, প্রথম পর্ব, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৬, পৃ- ৬৩
- ৮৩। ঋত্বিক ঘটক; আলোচনার জন্য মূল নীতির খসড়া, ঋত্বিক পদ্মা থেকে তিতাস, সুরমা ঘটক, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১০, পৃ- ১৮৫

৮৪। তদেব, পৃ- ১৭৩

৮৫। তদেব, পৃ- ১৮৩

৮৬। নিরঞ্জন সেন; সারা ভারত গণনাট্য সংঘের সপ্তম সম্মেলন, পরিচয়, মাঘ ১৩৫৯, পৃ- ৭২ ৮৭। FOR A PEOPLE'S THEATRE, UNITY, Volume 2, Number 8, P : I

৮৮। নিরঞ্জন সেন; গণনাট্য সম্মেলন, পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০, পৃ- ৪০৯

৮৯। প্রাণ্ডক্ত, IPTA Manifesto, গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, পৃ- ২৪০

৯০। প্রাগুক্ত, পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর, পূ- ১১০

৯১। প্রাগুক্ত, রিভিউ রিপোর্ট, গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, পৃ- ২৫৬

৯২। প্রাগুক্ত, অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক যুক্তফ্রন্টের স্বরূপ ও সমস্যা, তিন দশকের গণআন্দোলন, পৃ- ৪০

ຈບ · Sudhi Pradhan (Editor); Marxist Cultural Movement in India (MCMI), Vol.

2, National Book Agency, Calcutta, 1986, পৃ- ২৬৭-২৮৮ ৯৪। সজল রায়চৌধুরী; গণনাট্য কথা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ- ১৭৯ ৯৫। প্রাগুক্ত, গণনাট্য আন্দোলনের ঐতিহ্য, গণনাট্য পত্রিকা, পৃ- ১১১

৯৬। হীরেন ভট্টাচার্য; ইতিহাসের ধারা ও গণনাট্য, গণনাট্য পত্রিকা, সপ্তম বর্ষ, জুলাই ১৯৬৭, পৃ-৩৪